ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

Volume-V, Issue-II, December 2023

Government Brajalal College

Khulna, Bangladesh

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume-V, Issue-II December 2023

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal

Half-yearly Publication of Government Brajalal College

Editor

Professor Sharif Atiquzzaman Principal, Government Brajalal College

Review Committee

Professor Khandakar Hamidul Islam PhD	Head, Department of Islamic Histroy & Culture
Professor Khandakar Ahsanul Kabir PhD	Head, Department of Physics
Professor Md. Mizanur Rahman PhD	Head, Department of Social Work
Professor Hosne Ara PhD	Department of Zoology
Professor Shankar Kumar Mallick	Department of Bangla
Roxana Khanam	Associate Professor, Department of English
Dr. Emanul Haque	Associate Professor, Department of Bangla Goenka College of Commerce & Business Administration, Kolkata, India
Amal Kumar Gain	Assistant Professor, Department of History
Rami Chakraborty	Assistant Professor, Department of Bangla Assam University, India
Dr. Md. Sarwar Hossain	Assistant Professor, Department of Mathematics

Mailing Address

Government Brajalal College, Daulatpur, Khulna-9200, Bangladesh

Phone: 0088-02477702944 email: infoblcollege@gmail.com

Website: www.blcollege.edu.bd

Printed by

Rabi Printing Press

27, Samsur Rahman Road, Khulna-9100, Bangladesh

© **Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh**

ISSN: 2664-228X (Print)
ISSN: 2710-3684 (Online)

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume-V, Issue-II December 2023

Contents

বাংলা অংশ

- রাজশেখর বসুর পরিভাষা ভাবনা
  ড. বিপ্লব দত্ত 7-13
- *ভারতী* পত্রিকায় শরৎকুমারী চৌধুরানী সহজ-সরল জীবনবোধের অপর নাম
  সুস্মিতা বণিক 14-21
- সমাজ পরিবর্তনে কীর্তন: একটি সমীক্ষা
  ড. সুদেষ্ণা বণিক 22-28
- বয়ঃসন্ধির ট্রানজিট পিরিয়ড: প্রসঙ্গ অসমিয়া ঔপন্যাসিক ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার কিশোর উপন্যাস 'মরমর দেউতা'
  জাহ্নবী দাশ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য 29-38
- 'কল্লোল' পত্রিকার শতবর্ষ : বাংলা সাহিত্যে পালাবদলের ভূমিকা
  শংকর কুমার মল্লিক 39-52

English Section

- Exploring Eco-tourism Treasure of North-eastern States of India: A Sustainability Perspective
  Dr. Suman Kalyan Chaudhury, Dr. Sukanta Sarkar & Dr. Manaswini Patra 55-68
- Abandoned at Old Age: Aging in Contemporary Nepali Short Fiction
  Komal Prasad Phuyal, PhD 69-80
- Exploring Domestic Violence and Child Abuse in Select Novels of Toni Morrison
  Roxana Khanom 81-91
- Genocide and Ecological Ruin in Amitav Ghosh's *The Nutmeg's Curse: Parables for a Planet in Crisis*
  Kamal Sharma 92-111
- Ecocritical Reading in Select Works of Rabindranath Tagore
  Professor Sharif Atiquzzaman 112-117

ISSN: 2664-228X (Print)
ISSN: 2710-3684 (Online)

Government Brajalal College
Khulna
Bangladesh

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume-V, Issue-II December 2023

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal
Half-yearly Publication of Government Brajalal College
December 2023

Published by

Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh

Disclaimer

The opinions expressed in the articles published in this journal are the opinions of the authors. The members of the review committee, the editor or the publisher of the *BL College Journal* are in no way responsible for the opinions expressed by the authors or the conclusions deduced by them.

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume-V, Issue-II December 2023

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

ISSN: 2664-228X (Print)
ISSN: 2710-3684 (Online)

Contents

বাংলা অংশ

- রাজশেখর বসুর পরিভাষা ভাবনা
  ড. বিপ্লব দত্ত 7-13
- *ভারতী* পত্রিকায় শরৎকুমারী চৌধুরানী সহজ-সরল জীবনবোধের অপর নাম
  সুস্মিতা বণিক 14-21
- সমাজ পরিবর্তনে কীর্তন: একটি সমীক্ষা
  ড. সুদেষ্ণা বণিক 22-28
- বয়ঃসন্ধির ট্রানজিট পিরিয়ড: প্রসঙ্গ অসমিয়া ঔপন্যাসিক ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার কিশোর উপন্যাস 'মরমর দেউতা'
  জাহ্নবী দাশ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য 29-38
- 'কল্লোল' পত্রিকার শতবর্ষ : বাংলা সাহিত্যে পালাবদলের ভূমিকা
  শংকর কুমার মল্লিক 39-52

Government Brajalal College
Khulna
Bangladesh

Volume -V, Issue-II, December 2023

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2023v5i2bg1
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -V, Issue-II, December 2023
Pp. 07-13

রাজশেখর বসুর পরিভাষা ভাবনা

ড. বিপ্লব দত্ত

সারসংক্ষেপ

জ্ঞান-বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে পরিভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষা অর্থে যা বুঝি পরিভাষা তা নয়, পরিভাষা বলতে বিশেষ কিছু শব্দসমূহকে বুঝি। ভাষা বদলে গেলে পরিভাষিক শব্দগুলিকে সেই নির্দিষ্ট ভাষায় বদলে ফেলা সবসময় সম্ভব হয় না। তাই পরিভাষা নির্মাণ যে সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন এমনটিও নয়। আমরা পরিভাষা ঋণ নিতে পারি, যেমন, আইন-আদালত ইত্যাদি শব্দগুলি আমরা ঋণ হিসেবে অনেকদিনই গ্রহণ করে নিয়েছি। যে ক্ষেত্রে পরিভাষা ঋণ করে কাজ চালাতে গিয়ে বুঝি যে আমাদের ভাষাতেও একটি শব্দ দরকার তখন আমরা সম-অর্থবোধক নতুন শব্দ বেছে বা তৈরি করে নিই। পরিভাষা চর্চার ইতিহাস বেশ পুরানো। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র ২ বর্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে পরিভাষা বিষয়ক নানা প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরাও পরিভাষাচর্চা করেছেন। পরিভাষা চর্চার ক্ষেত্রে যে নামটি অত্যন্ত বেশি প্রাসঙ্গিক তিনি রাজশেখর বসু। রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অভিধানের শেষে ৩০৭৮ টি পারিভাষিক শব্দের একটি তালিকা দিয়েছেন। তিনি পরিভাষা সমিতির সুপারিশ থেকে পছন্দমতো পরিভাষা গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও রাজশেখর পরিভাষা নিয়ে নানা সময়ে নানা বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি প্রবন্ধ হলো 'বাংলা পরিভাষা' ও 'সরকারী পরিভাষা'। এগুলি থেকেই তাঁর পরিভাষা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। পরিভাষা সংক্রান্ত তাঁর নানা ভাবনা-চিন্তার পর্যালোচনাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ড. বিপ্লব দত্ত
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ডেবরা থানা শহিদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail : biplab38@gmail.com

মূলশব্দ

পরিভাষা, রাজশেখর বসু, চলন্তিকা অভিধান, বাংলা পরিভাষা, সরকারী পরিভাষা, সাংস্কৃতিক ঋণ, পরিকল্পনা

ভূমিকা

'পরি' একটি উপসর্গ আর তার সঙ্গে 'ভাষা' যুক্ত করে 'পরিভাষা'[১] শব্দ তৈরি করা হয়েছে। রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অভিধানে পরিভাষা বলতে বোঝানো হয়েছে 'বিশেষ অর্থবোধক শব্দ'। বিশেষ অর্থবোধক শব্দের প্রয়োজন হয় তখনই যখন সেই বিশেষ অর্থটা আমাদের জানা থাকে। সাধারণ জীবনে খুব বেশি বিশেষ অর্থবোধক শব্দের প্রয়োজন না হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় এর প্রয়োজন আছে। কোনো একটি 'পরিভাষা' সম্পর্কে আমরা অবহিত হলে, তার পরিবর্তে কোনো শব্দ আমাদের নিজস্ব শব্দভান্ডারে আছে কী না সেটা আগে দেখা হয়। একটি বিষয় আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার যে 'উপভাষা', 'সমাজভাষা'র মতো পরিভাষা পৃথক কোনো ভাষা নয়, তা হল ভাষার অন্তর্গত বিশেষ কিছু শব্দসমূহ।[২] ইংরেজিতে 'Term' ও 'Terminology'-র মধ্যে পার্থক্য আছে; প্রথমটির অর্থ হল 'শব্দ' এবং পরেরটির অর্থ হল 'পদ্ধতি'। যেমন, এম এইচ আব্রামস-এর একটি বই-এর নাম A Glossary of Literary Terms।

পরিভাষা নির্মাণ যে সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন এমনও নয়। আমরা পরিভাষা ঋণ নিতে পারি, যেমন আইন-আদালত ইত্যাদি শব্দগুলি আমরা ঋণ হিসেবে অনেকদিনই গ্রহণ করে নিয়েছি। এগুলো সাধারণত সরকারি কাজের প্রয়োজনের জন্য নির্দিষ্ট। সাধারণ মানুষজনও এই সব পরিভাষাগুলি সম্পর্কে অল্পবিস্তর ওয়াকিবহাল থাকে। যে ক্ষেত্রে পরিভাষা ঋণ করে কাজ চালাতে গিয়ে বুঝি যে আমাদের ভাষাতেও একটি শব্দ দরকার তখন আমরা সমার্থবোধক নতুন শব্দ বেছে বা তৈরি করে নিই। কিন্তু পরিভাষা তৈরি করে নিলেই যে মানুষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে এমনটি নয়। যেমন, নাইট্রোজেন- কে 'নেত্রজল' বা অ্যাসিটিলিন-কে 'অসিতীলিন' বলার চেষ্টা হয়েছিল, কালের নিয়মে তা টেকেনি। আবার ক্লাসিক শব্দটি প্রচলিত থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিভাষা করেছিলেন 'ধ্রুপদ'। 'ধ্রুপদ' শব্দটিও কিন্তু প্রচলিত। অন্যদিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের 'দ্বন্দ্ব সমাস' শব্দটিকে বিদেশী ভাষাতাত্ত্বিকরা 'Compound' করে নিয়েছেন। এরকম বহু সংস্কৃত শব্দ বিদেশীরাও গ্রহণ করেছেন পরিভাষা হিসেবে অর্থাৎ জ্ঞানচর্চা পরিভাষা ছাড়া চলতে পারে না।

আমরা ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষার সংস্পর্শে এসে যখন নতুন নতুন ভাব বা বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হই, যেগুলির জন্য নির্দিষ্ট শব্দ আমাদের শব্দভান্ডারে অনেকক্ষেত্রে থাকে না। সাধারণ মানুষ সেগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে হতে বিদেশি শব্দটিকেই অনেকসময় আপন করে নেয় বা উচ্চারণের অসুবিধা হলে সেটির ধ্বনি পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলে। যেমন, 'গ্লাস' হয়ে যায় 'গেলাস' বা 'হসপিটাল' হয়ে যায় 'হাসপাতাল'। পবিত্র সরকার[৩] (২০১৩: ২২৮) বলেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রচুর উপাদান-উপকরণ গ্রহণ করেছি। এগুলি আমাদের সাংস্কৃতিক ঋণ। এই ঋণ প্রধানত তিন ধরনের: বস্তুগত (material) প্রাতিষ্ঠানিক[৪] (institutional) ও ভাবগত (identical)"। বস্তুগত বলতে তিনি দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নানা উপাদান যেমন চেয়ার, টেবিল, ফ্রিজ ইত্যাদি বুঝিয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক বলতে বুঝিয়েছেন

---

১ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ শবদটির যে বুৎপত্তি দেওয়া আছে তা হল– পরি+√ভাষ্+অ+ভা+স্ত্রী আ

২ ভাষা-চিন্তক পলাশ বরন পাল-এর ব্যবহৃত 'পরিশব্দ'– শব্দটি গ্রহণ করা যায় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে।

৩ সরকার, পবিত্র, "চমস্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান", ২০১৩ (পৃষ্ঠা-২২৮) গ্রন্থে 'পরিভাষা-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্র পরিভাষা' অধ্যায়ে পরিভাষা প্রসঙ্গে বহু সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন।

৪ এই পরিভাষাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর দেওয়া।

শিক্ষাব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়, যেমন, কলেজ, স্কুল, পার্লামেন্ট ইত্যাদি। ভাবগত বলতে বুঝিয়েছেন ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ইত্যাদি নানা বিষয়। উনিশ শতক থেকে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর পরে ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। বিদেশি শিক্ষাদানের পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে বাঙালি খুব তাড়াতাড়িই ইংরেজদের ভাবধারার সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। উচ্চশিক্ষায় মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি চালু হলেও স্কুল স্তরে বাংলা মাধ্যমই চালু ছিল। নিম্নপ্রাইমারি স্তরের প্রয়োজনে প্রচুর পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজন হয়েছিল তাই বাংলায় বিদেশি পরিভাষাগুলিকে গ্রহণ বা নতুন করে বাংলায় রূপান্তর ঘটানো শুরু হয়েছিল।

পরিভাষা চর্চার ইতিহাস বেশ পুরানো। ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৭৭ সালে "Scheme for the Rendering of European Terms into the Vernaculars of India"[৫] নামে একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন যেখানে তিনি পরিভাষা নির্মাণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এরকম আরও একটি পরিকল্পনার কথা জানা যায়। বি এন শীল ১৯৩৯ সালে "Note on the Question of a Uniform Scientific Terminology for India" নামে একটি নীতি প্রণয়ন করেছিলেন যেটি ১৯৪১ সালে ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগ থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'[৬]র ২ বর্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে পরিভাষা বিষয়ক নানা প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পরিভাষাচর্চা করেছেন। পরিভাষা চর্চার ক্ষেত্রে যে নামটি অত্যন্ত বেশি প্রাসঙ্গিক তিনি রাজশেখর বসু।

পরিভাষা চর্চার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল বিদ্যাশিক্ষা চর্চার প্রয়োজনেই। সূচনাকালেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, রাসায়নিক পরিভাষা, আলোকবিজ্ঞানের পরিভাষা, গণিতের পরিভাষা, ভৌগলিক পরিভাষা ইত্যাদি এই নামে অসংখ্য প্রবন্ধ[৭] প্রকাশিত হয়েছিল। পরিভাষা নির্মাণের স্বাধীনতা লেখকদের আছে কিন্তু একটি বিষয়ের একাধিক পরিভাষা থাকাও সমস্যার। Culture-এর বাংলা পরিভাষা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় করেছেন 'সংস্কৃতি' আবার রবীন্দ্রনাথ করেছেন 'কৃষ্টি'। অনেক সময় এক্ষেত্রে কোনো একটি পরিভাষা সমাজে প্রচলিত হয়ে যায়। ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক একটি পরিভাষা 'Phoneme' যাকে কোনো তাত্ত্বিক বলেছেন 'মূলধ্বনি' আবার কেউ বলেছেন 'স্বনিম'। পরিভাষা বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার জন্য ১৯৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিভাষা সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন রাজশেখর বসু। এছাড়াও যারা সরাসরি পরিভাষা সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন, প্রমথনাথ বিশী, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ।

রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অভিধানের[৮] শেষে ৩০৭৮টি পারিভাষিক শব্দের একটি তালিকা দিয়েছেন। তিনি পরিভাষা সমিতির সুপারিশ থেকে পছন্দমতো পরিভাষা গ্রহণ করেছিলেন। ফাল্গুন ১৩৫৮ সংস্করণের ভূমিকায়

---

৫ এই পরিকল্পনাটির কথা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর "ভারতীয় পরিভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধটি তাঁর "সাংস্কৃতিকী" গ্রন্থে সংকলিত।

৬ এর বিস্তারিত সূচিপত্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "পরিষৎ-পরিচয়" গ্রন্থে আছে। আগ্রহীরা চাইলে দেখে নিতে পারেন।

৭ আজাদ, হুমায়ুন ২০০১, 'বাংলা ভাষা' (২য় খণ্ড) পৃ. ৪২৭–৫২৯।

৮ 'চলন্তিকা' গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৯৩০ সাল। ১৯৩৪ সালে পরিভাষা সমিতি গঠিত হয়। তাঁর এই বক্তব্য বলে দেয় যে পরিভাষা পরিশিষ্টে যুক্ত করেছিলেন ১৯৩৪-এর পরে।

তিনি বলেছেন "পরিশিষ্টে যে পারিভাষিক শব্দাবলী দেওয়া হইয়াছে তাহার 'পাটীগণিত' হইতে 'মনোবিদ্যা' বিষয়ক অংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলন হইতে উদ্ধৃত। 'সরকারী কার্য' বিষয়ক অংশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংকলন হইতে উদ্ধৃত"। যে পরিভাষাগুলো তিনি তালিকাবদ্ধ করেছেন হয়তো তার একটি অংশ তাঁর নিজেরই তৈরি করা, পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের কথা স্মরণে রেখে এটুকু অনুমান করে নেওয়াই যায়। তাছাড়া তিনিই পরিভাষা সমিতির সভাপতি ছিলেন। চলন্তিকা'র শেষে তাঁর পছন্দের যে পরিভাষাগুলো দিয়েছেন সেগুলোর বিষয়ভেদে আলাদা তালিকা করেছেন। তালিকাগুলির শিরোনাম[৯] ও অন্তর্ভুক্ত পরিভাষার সংখ্যা নীচে দেওয়া হলো:

১) পাটীগণিত — Arithmetic, exRMwYZ— Algebra (১৩৯ টি)

২) জ্যামিতিড় Geometry, KwbK— Conics, ত্রিকোণমিতি— Trigonometry (১৪১টি)

৩) বলবিদ্যা—Mechanics (৭০টি)

৪) পদার্থবিদ্যা— Physics (১৮৯ টি)

৫) রসায়ন— Chemistry (২৭৮ টি)

৬) জ্যোতিষ—Astronomy (১১৫ টি)

৭) ভূগোল— Geography, ভূবিদ্যা—Geology (১৭২ টি)

৮) জীববিদ্যা—Biology (১২১ টি)

৮) উদ্ভিদ্বিদ্যা—Botany (১০০ টি)

৯) প্রাণিবিদ্যা— Zoology (১২১ টি)

১০) শারীরবৃত্ত— Physiology, স্বাস্থ্যবিদ্যা— Hygiene (২৩৫ টি)

১১) অর্থবিদ্যা— Economics (২৭২ টি)

১২) মনোবিদ্যা—Psychology, দর্শন— Philosophy, wewea— Miscellaneous (৫১০ টি)

১৩) সরকারী কার্য— Public Services (৬১৫ টি)

এছাড়াও রাজশেখর পরিভাষা নিয়ে নানা সময়ে নানা বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি প্রবন্ধ হলো, 'বাংলা পরিভাষা' ও 'সরকারী পরিভাষা'। এগুলি থেকেই তাঁর পরিভাষা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী পরিভাষা সমিতির সক্রিয় সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে তালিকা তৈরি হয়েছে সেখানে এটা দাবি করা অর্থহীন যে সব কৃতিত্ব রাজশেখরের। তাই আমরা এখানে পরিভাষার তালিকার পাশাপাশি দেখব পরিভাষা নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর অভিমত কী। তাতে আমরা বুঝতে পারবো তিনি পরিভাষা

৯ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত পরিভাষার সংখ্যাগুলি হিসাব করে দিয়েছেন আমাদের ছাত্রী লক্ষ্মী বারাট্টা।

নির্বাচন বা তৈরির সময়ে কোন ভাবনা দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। পাশাপাশি রাজেন্দ্রলাল মিত্র বা বি এন শীলের তৈরি পদ্ধতির সঙ্গেও আমরা মিলিয়ে দেখলে বুঝতে পারব যে রাজশেখরের পরিভাষা নির্বাচন ভাবনা অন্যদের থেকে কতটা আলাদা।

কেউ কেউ মনে করেন জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় যে যে পরিভাষা চলে আসে সেগুলিকে ঋণ নিলেই নতুন করে নিজস্ব পরিভাষা নিয়ে ভাবতে হয় না। বাংলা শব্দভাণ্ডার নানা সময়ে বিদেশি শব্দের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। কিন্তু পরিভাষা হলো ভাষার নিজস্ব সম্পদ। অর্থাৎ আমরা মনে করি বাংলা ভাষায় যদি বিদেশি পরিভাষার সমযোগ্য শব্দ তৈরি করে নিতে পারি তাহলে সেই পরিভাষাটিকে আমরা বেশি আপন করে নিতে পারবো। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কাজে বেশি সহায়ক হবে। রাজশেখর বসু বলেছেন,[১০] "আমাদের দেশে এখনও উচ্চশিক্ষার বাহন ইংরেজী ভাষা। নিম্নশিক্ষায় মাতৃভাষা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষা উচ্চই হোক আর নিম্নই হোক, মাতৃভাষাই যে শ্রেষ্ঠ বাহন তা সকলে ক্রমশ বুঝতে পারছেন। মাতৃভাষায় প্রয়োগের উপযুক্ত পরিভাষা যতদিন প্রতিষ্ঠালাভ না করবে ততদিন বাহন পঙ্গু থাকবে। অতএব বাংলা পরিভাষার প্রতিষ্ঠা আবশ্যক।" এক্ষেত্রে তিনি আশঙ্কার কথাও শুনিয়েছেন। তিনি মনে করেছেন পরিভাষা শুধু তৈরি করলেই হবে না, তার ব্যাপক প্রচলনও দরকার। কারণ ইংরাজি ভাষার প্রবল প্রতিযোগিতার সঙ্গে টিকে থাকা খুব সহজ নয়। বিশেষত বিদেশ থেকে আসা দ্রব্যের নামের বাংলা পরিভাষা তৈরি করা হলেও জনগণ বিদেশি নামের সঙ্গেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই কেউ শিক্ষা-অর্জনের সময় বাংলা পরিভাষাগুলি শিখলেও দেখা যায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইংরেজির শরণাপন্ন হল। সরকারি স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরিভাষার প্রচলন করা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান হবে না। এর কারণও হিসেবে রাজশেখর একটি যুক্তি দিয়েছেন[১১] তা হলো, বহু নব নব দ্রব্য ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যদি এদেশে আবিষ্কার হত, তবে আমাদের পরিভাষা দেশীয় ভাষার বশে স্বচ্ছন্দে গড়ে উঠত এবং বিদ্বান অবিদ্বান নির্বিশেষে সকলেই তা মেনে নিত, যেমন ইংল্যাণ্ডে হয়েছে।"

পরিভাষার কতগুলি শর্ত থাকা আবশ্যক। প্রাথমিক শর্ত বস্তু বা ভাবের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে সেই উপযোগী কোনো শব্দ বেছে নেওয়া। তাছাড়া পরিভাষা যেন সহজ ও সাবলীল হয়, খুব খটমট উচ্চারণ যেন না হয়। প্রাথমিকভাবে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে যে শব্দ নেই তার শূন্যস্থান ভরানোর জন্য প্রথমে প্রতিবেশীর নিকট আত্মীয় ভাষা থেকে ধার নেওয়া দরকার; না পেলে প্রতিবেশী ভাষার শরণাপন্ন হতে হবে। অর্থাৎ বাংলা ভাষার জন্য সংস্কৃত থেকেই ধার নেওয়া সহজ ও স্বাভাবিক। এখানে একটি সাবধানবাণী দিয়েছেন রাজশেখর। তিনি বলেছেন[১২], "মাতৃভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাই যদি প্রধান লক্ষ্য হয় তবে পরিভাষা সংকলন পণ্ড হবে।" বাংলা ভাষায় পরিভাষা নির্বাচনের সময়ে কোন কোন ভাষার ভাষাগত উপাদান ব্যবহার করা যেতে পারে তা তিনি একটি তালিকার মাধ্যমে দেখিয়েছেন। তালিকাটি[১৩] নিম্নরূপ:

ক) সাধারণ বাংলা শব্দ
খ) হিন্দী- উর্দু ফারসী আরবী শব্দ।

---

১০ আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা), ২০০১, দ্রঃ বসু, রাজশেখর, পৃ. ৪৫৫।
১১ ঐ, পৃ. ৪৫৬
১২ ঐ, পৃ. ৪৫৯
১৩ ঐ, পৃ. ৪৫৯

গ) ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ

ঘ) প্রাচীন বা নবরচিত সংস্কৃত শব্দ

ঙ) মিশ্র শব্দ, অর্থাৎ কৃত্রিম পদ্ধতিতে রূপান্তরিত বা যোজিত বিভিন্ন জাতীয় শব্দ

বহুভাষিক দেশ ভারতের যে কোনো ভাষায় পরিভাষা তৈরি করতে গেলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টিও মাথায় রাখা দরকার বলে মনে করেছেন রাজশেখর। তাই তাঁর পরামর্শ সংস্কৃত থেকে ধার নিয়ে প্রথমে পরিভাষার সংস্থান করা। কারণ ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাতেই বেশিরভাগ ভারতীয় কথা বলেন এমনকি দক্ষিণভারতীয় ভাষাগুলিতেও প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হয়েছে।

সাধারণ কাজকর্মে আমরা অনেক শব্দ ব্যবহার করি যেগুলিকে আবার বিশেষ অর্থেও[১৪] ব্যবহার করা যায়, যেমন— রক্ত, পিত্ত, তামা, সোনা, লোহা ইত্যাদি। ডাক্তার প্রেসক্রিপশানে লেখেন 'ব্লাড টেস্ট', বাংলায় 'রক্ত পরীক্ষা' লেখেন না। ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই ধরনের শব্দগুলিকে বিশেষ অর্থে পারিভাষিক শব্দ হিসাবে প্রয়োগ করার কথা বলেছেন। ঠিক একই কথা বলছেন রাজশেখর বসু। তিনি বলেছেন, "লোহা তামা সোনা প্রভৃতি নাম পণ্ডিতাগমের পূর্ববর্তী তাই অখ্যাত। পণ্ডিতগণ যদি বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে 'প্লাটিনাম অ্যালুমিনিয়াম' প্রভৃতি নামজাদা শব্দের পাশে স্থান দেন, তবে 'লোহা তামা সোনা'ও পরিভাষা হিসাবে গণ্য হবে"। বি এন শীল[১৫] প্রায় একইভাবে বলেছেন সহজ সাবলীল বস্তুনাম ভারতীয় ভাষায় থেকে থাকলে তা আগে গ্রহণ করতে হবে।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে দর্শন, ব্যাকরণ, গণিত ইত্যাদির চর্চা হয়ে আসছে। প্রাচীন শাস্ত্রে এ রকম অনেক পরিভাষা ব্যবহৃত হত। সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ ইত্যাদি শব্দগুলি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। রাজশেখর বলছেন এর সঙ্গে কলন (calculas), অবঘাতন (involution) ইত্যাদি নতুন তৈরি হওয়া শব্দগুলিকেও গ্রহণ করতে হবে। অন্যদিকে জটিল বস্তু নামগুলির ক্ষেত্রে বিদেশি শব্দ সরাসরি গ্রহণ করার পক্ষেই মতামত দিয়েছেন। মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যান্টিমনি থায়োফস্ফেট-এর পরিভাষা করেছিলেন 'অন্তমনসশুল্বভাস্ফেত', যা উচ্চারণ করা কার্যত অসম্ভব। তার থেকে ইংরেজি নাম অনেক বেশি গ্রহণীয়।

পরিভাষা তৈরির সময়ে অনেক সচেতনতার প্রয়োজন হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে পরিভাষা সহজ-সরল হবে যাতে তা গ্রহণ করতে কারও অসুবিধা না হয়। অনেক সময়ে এমনও দেখা যায় পরিভাষাটি মূল পরিভাষা থেকে বেশি ভালো হয়ে উঠল। যেমনড় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে ইংরেজি Map -এর বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে মানচিত্র। এই মানচিত্র শব্দের মধ্যে 'মান' আছে যার অর্থ পরিমাপ আর চিত্র অর্থাৎ 'a drawing on a scale'। Map শব্দটি এসেছে 'Mappa' থেকে, যার অর্থ গামছা। সুতরাং 'মানচিত্র' বেশি অর্থবহ ও বেশি ভালো। রাজশেখর বলেছেন যে ইংরাজি শব্দের অভিধা যথাযথ বজায় রাখার থেকে সংজ্ঞার্থ ঠিক রাখা বেশি প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে দেশি শব্দের অর্থের সংকোচ বা প্রসার ঘটলেও অসুবিধা নেই।

---

১৪ পণ্ডিতেরা যদি ঠিক করেন যে মাছ বললে কানকো ওয়ালা, আঁশ ও পাখনা যুক্ত জলজ প্রাণিকে বোঝাবে তাহলে এটা হল মাছ শব্দটির বিজ্ঞানসম্মত বিশেষ অর্থ। সেক্ষেত্রে চিংড়ি, সিঙ্গি ও মাগুরকেও মাছ বলা যাবে না। দ্রঃ রাজশেখর বসু, বাংলা পরিভাষা।

১৫ দার্শনিক স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পুত্র।

আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চায় অনেক আধুনিক পরিভাষা এসেছে সেগুলির জন্য বাংলায় নতুন করে পরিভাষা নির্মাণ করার প্রয়োজন নেই বলেই মনে করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বি এন শীল প্রমুখেরা। রাজশেখর বসু সরাসরি কিছু না বললেও তিনি সমর্থন করেছেন। তিনি কোনো এক লোকপ্রিয় অধ্যাপকের রচনাংশ থেকে উদ্ধৃতি[১৬] তুলে বলেছেন যে লেখক ইংরেজি শব্দ নির্ভয়ে আত্মসাৎ করেছেন, তাও মাতৃভাষার জাতিনাশ করেননি। কিন্তু তাঁর অভিমত হল যে জ্ঞানচর্চার যে অংশটি theoretical সেখানে সাধারণের যোগ থাকে না, জ্ঞানপিপাসুদেরই সাধারণত সেখানে প্রবেশাধিকার থাকে আর তারা নতুন শব্দ শিখে নিতে পারবে। Applied বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রটি যেহেতু সবার জন্য তাই সেখানে দ্বিধাহীনভাবে ইংরেজি শব্দ মেনে নিতে হবে।

অন্যান্য পরিভাষা থেকে সরকারি পরিভাষার বিষয়টি আলাদা। ভারত বহুভাষিক দেশ এবং যেহেতু সরকারি পরিভাষা প্রশাসনিক কাজেও ব্যবহৃত হয় তাই নির্দিষ্ট কোনো একটি ভাষার পরিভাষা অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষ নাও বুঝতে পারে। ইংরেজ শাসনের সময় থেকেই বহু ইংরেজি শব্দ সরকারি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রাজশেখর বসু বলেছেন[১৭], "সর্বভারতীয় পরিভাষায় সমস্ত (বা অধিকাংশ) শব্দ সর্ব প্রদেশে সুবোধ্য করা অসম্ভব, যাহাতে সর্ব প্রদেশে গ্রহণযোগ্য হয় সেটাই করা উচিত।" এক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃত ভাষা থেকে পরিভাষা গ্রহণ করাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তিনি বলেছেন যে, প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে এবং সন্ধি-সমাসের সাহায্যে সংক্ষেপে পরিভাষা রচনার অসামান্য শক্তি সংস্কৃত ভাষার আছে।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের গুরুত্ব সবাই স্বীকার করেন কিন্তু তা করতে গেলে শুধু নিম্নপ্রাথমিক নয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মাতৃভাষাকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তাই উচ্চশিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তক বাংলায় থাকা দরকার। পাঠ্যপুস্তকে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত কোন পরিভাষা ঋণ নিতে হবে, আর কোন শব্দের পরিভাষা তৈরি করতে হবে তার একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা থাকা দরকার তাই বাংলা পরিভাষা নিয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ ও বিশেষ করে রাজশেখর বসু এই প্রয়োজনটি বুঝতে পেরেছেন। তিনি পরিভাষা চিন্তার পথ প্রদর্শক।

গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন, ২০০১, 'বাঙলা ভাষা'(দ্বিতীয় খণ্ড), ঢাকা: আগামী প্রকাশনী
আঢ্য, হেমন্তকুমার, ২০১৯, 'রাজশেখর বসু', কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৯১, 'সাংস্কৃতিকী', কলকাতা: আনন্দ
পাল, পলাশ বরন, ২০১১, 'আ মরি বাংলা ভাষা', কলকাতা: অনুষ্টুপ
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, ১৪১৫, 'পরিষৎ পরিচয়', কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
বসু, রাজশেখর, ১৪১৮, 'চলন্তিকা', কলকাতা: এম সি সরকার
ঐ , ২০২২, প্রবন্ধ সংগ্রহ', কলকাতা: ঋত প্রকাশন
সরকার, পবিত্র, ২০১৩, 'চমস্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান', কলকাতা: পুনশ্চ

---

১৬ "রুমকর্ফ কয়েল ছাড়া আরও অনেক প্রক্রিয়া দ্বারা পদার্থ হইতে ইলেকট্রন বাহির করা যায়। রঞ্জনরশ্মি কোন পদার্থের উপর ফেলিলে বা সেই পদার্থ রেডিয়ামের ন্যায় কোন ধাতুর নিকট রাখিলে সেই পদার্থ হইতে ইলেকট্রন নির্গত হয়।"

১৭ বসু, রাজশেখর, ২০২২: ৪১৩

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2023v5i2bg2
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -V, Issue-II, December 2023
Pp. 14-21

ভারতী পত্রিকায় শরৎকুমারী চৌধুরানী সহজ-সরল জীবনবোধের অপর নাম

সুস্মিতা বণিক

সারসংক্ষেপ

ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে ঠাকুর-বাড়ির 'ভারতী' পত্রিকার প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘস্থায়ী এই পত্রিকা জন্ম দিয়েছিল বহু লেখিকার, যাঁরা সমকালীন পাঠকদের মনে জায়গা করে নেওয়ার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও ছাপ রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শরৎকুমারী চৌধুরানী, সহজ-সরল লেখনীর গুণে তিনি অনায়াসেই তুলে ধরতে পেরেছিলেন তৎকালীন সমাজের নানা চিত্র, নিজের সরস ভাবনার ছোঁয়ায় তাদেরকে করে তুলেছিলেন জীবন্ত। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর মোট রচনার সংখ্যা ১১টি। রচনাগুলোর মধ্য দিয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তা, সামাজিক বোধ, লেখন-রীতির যে প্রকাশ ঘটেছে, তারই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

সুস্মিতা বণিক
এম এ, বি এড, এম ফিল.
(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
পিএইচডি (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
বাংলা বিভাগ
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: baniksusmita2012@gmail.com

মূলশব্দ

মেয়ে-যজ্ঞি, মেয়ে-মজলিস, পাল্কি ওঠা, লুচি তোলা, সরা বাঁধা, শিল্পাশ্রম

ভূমিকা

উনিশ শতককে বলা হত 'পত্র-পত্রিকার যুগ'। এই যুগে বহু পত্রিকা জন্ম নিয়েছে, যদিও তার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল স্বল্পজীবী, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব সমন্বিত পত্রিকার সংখ্যাও নেহাত মুষ্টিমেয় ছিল না। 'ভারতী' (১২৮৪-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ; ১৮৭৭-১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ) পত্রিকা ছিল এই দ্বিতীয় শ্রেণির সদস্য। পুরাতনপন্থী ও প্রগতিশীল—এই দুই সমাজের মধ্যবিন্দুতে ছিল এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবস্থান। দেশীয় সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ-মনস্কতা, সমকালীন আবহের সুরুচিকর প্রতিফলন ও দেশীয় ভাবধারায় দেশে-বিদেশে প্রাপ্ত জ্ঞানের সুস্থ আলোচনাই ছিল এই পত্রিকার মূল লক্ষ্য।

বিখ্যাত বহু লেখকের পাশাপাশি অসংখ্য মহিলা-লেখকের রচনাও 'ভারতী'কে সমৃদ্ধ করেছে দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে। শরৎকুমারী চৌধুরাণী ছিলেন এই লেখিকা-কুলের মধ্যে অন্যতম এক রত্ন। জন্ম: ১৫.৭.১৮৬১, মৃত্যু:

১১.৪.১৯২০। বিশিষ্ট গদ্যলেখিকা। পিতা: শশীভূষণ বসু। শৈশবে পিতার কর্মস্থল লাহোরে বেড়ে উঠেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছিলেন লাহোরিনী। তাঁর স্বামী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও তিনি ঠাকুর-পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। 'ভারতী'র সম্পাদকীয় চক্রে এঁরা উভয়ে উৎসাহী সভ্য এবং মাতৃভাষার পরম অনুরাগী ছিলেন। 'ভারতী', 'ভারতী ও বালক', 'সাধনা', 'ভাণ্ডার', 'বঙ্গদর্শন', 'মানসী', 'ধ্রুব', 'সবুজপত্র', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', 'বিশ্বভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর স্বাক্ষরহীন বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। একমাত্র 'শুভবিবাহ' ছাড়া আর কোনো রচনাই তাঁর জীবৎকালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে কিছুকাল আগে তাঁর সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

'ভারতী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধ : কলিকাতার স্ত্রী সমাজ (ভাদ্র, কার্ত্তিক, ১২৮৮), শ্বাশুড়ী বৌ (আষাঢ়, ১২৯৮), একাল ও একালের মেয়ে (আশ্বিন, মাঘ, ১২৯৮), স্বায়ত্ত সুখ (কার্ত্তিক, ১৩০৬), শ্রী পঞ্চমী (আষাঢ়, ১৩১৫), মেয়ে যজ্ঞি (ভাদ্র, ১৩১৫; অগ্রহায়ণ, ১৩১৭), স্বর্গীয় ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬), ত্রিপুরার গল্প (ভাদ্র, ১৩১৬), মেয়ে যজ্ঞির বিশৃঙ্খলা (পৌষ, ১৩১৬), লক্ষ্মীশ্রী (পৌষ, ১৩১৭), নারী শিক্ষা ও মহিলা শিল্পাশ্রম (ফাল্গুন, ১৩২৩)।

পদ্ধতি : প্রবন্ধটিতে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বনের পাশাপাশি আকর বা উৎস পত্রিকা 'ভারতী' ও বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য গৃহীত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : 'ভারতী' পত্রিকার লেখিকাদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্টজন হলেন শরৎকুমারী চৌধুরানী। পত্রিকাটির জন্মলগ্ন থেকেই এর সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ। "শরৎকুমারী ও তাঁর স্বামী অক্ষয় চৌধুরী 'ভারতী'র পরিচালন সমিতির সক্রিয় সদস্য শুধু ছিলেন না, রবীন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যস্ততার জন্য অনেক সময়ই পত্রিকার মূল দায়িত্ব বহন করেছেন অক্ষয় চৌধুরী। গদ্য-পদ্য উভয় বিষয়েই তিনি এই কাজ করেছেন।"[১]

১২৮৮ থেকে ১৩২৩ পর্যন্ত শরৎকুমারী দেবীর বিভিন্ন ধরনের রচনা প্রকাশিত হয় 'ভারতী', 'ভারতী ও বালক', 'বঙ্গদর্শন', 'মানসী', 'সবুজপত্র', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'ধ্রুব', 'বিশ্বভারতী' প্রভৃতি নানা নামকরা পত্রিকায়। এর মধ্যে দশটি প্রবন্ধ প্রকাশ পায় 'ভারতী'তে। এই প্রবন্ধগুলোতে অধ্যাপক ড. জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় দুটি ধরন লক্ষ্য করেছেন। এক) সমাজ বিষয়ক ও দুই) স্মৃতিচারণমূলক। প্রথম জাতীয় রচনাগুলোতে "উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের কলিকাতার সমাজ, অন্তঃপুরের কথার বিস্তৃত বর্ণনা পেয়ে যাই।....এ শুধু বর্ণনা নয়, যেন জলছবি। প্রতিটি ঘটনা অভিজ্ঞতাপ্রসূত, তাই ঘটনাগুলোর বর্ণনায় নারী-পুরুষ উভয়ের অবস্থান, উভয়ের মতামত, মতাদর্শগত মিল অমিল সবই অনুপুঙ্খভাবে লিখিত হয়েছে।"[২] ঊনবিংশ শতকের স্ত্রী সমাজের একটি জীবন্ত ছবি আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন শরৎকুমারী, সিমলায় বসে লেখা 'কলিকাতার স্ত্রী সমাজ' (ভারতী, ভাদ্র, ১২৮৮) রচনায়। এই প্রবন্ধের নেপথ্য ইতিহাসটি তিনি বলেছেন পরবর্তীকালে 'মেয়ে যজ্ঞির বিশৃঙ্খলা' (পৌষ, ১৩১৬) প্রবন্ধে। 'ভারতী'র প্রথম প্রকাশের যুগে নিজের জীবন-অভিজ্ঞতাকে বহু মানুষের অনুরোধে ও জোরাজুরিতে লিপিবদ্ধকরার পর গুরুজনের কাছ থেকে লাঞ্ছনা ভোগের ঘটনাটিকে অনলংকৃত ভাবেই এখানে প্রকাশ করেছেন তিনি।

মেয়ে মজলিসে কী কী ঘটে, নিমন্ত্রিতদের কী অবস্থা হয়, মেয়েদের বিচিত্র সাজপোশাকের রূপ, নানা বয়সের মেয়েদের মধ্যে আলাপচারিতার রকমফের ইত্যাদি এত সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ সজীব ভাষায় তিনি বর্ণনা করেছেন যে, পড়ে অবাক হতে হয়। সাহিত্য রচনায় অনভিজ্ঞা এক নারী যে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে এমন উজ্জ্বলভাবে কথায় আঁকতে পারেন তা শরৎকুমারীর লেখা আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয়। সমকালীন কলকাতার স্ত্রী সমাজের রুচি, চিন্তা, সংস্কার, আচার, চাহিদাগুলোকে তিনি কয়েকটি মাত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে মূর্ত করে তুলেছেন। ঊনবিংশ শতকে সমাজবদলের চিত্রটিকে সঠিকভাবে চিনে নিতেও তিনি আমাদেরকে সাহায্য করেন। মেয়ে মজলিসের নানা ঘটনা, গোলমাল, স্বার্থপরতা, স্বজনপোষণ প্রভৃতির পাশাপাশি সমকালীন সমাজে প্রচলিত কতগুলো নতুন শব্দের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। যেমন– লুচি তোলা, সরা বাঁধা ইত্যাদি। এই বিষয়গুলোকে সরস বর্ণনার মধ্য দিয়ে বেশ উপভোগ্য করে তুলেছেন তিনি। আরও একটি স্বভাব আগে মেয়েদের মধ্যে ছিল, তার কথাও জানাতে ভোলেননি, "আগে আগে দেখতুম বড় মানুষের মেয়েরা রূপার গেলাস, রূপার পানের ডিপে সঙ্গে নিয়ে আসতেন, সক্কলের মাঝখান নিজের গ্লাসে জল খাওয়া হোত, পান খাওয়া হোত- এখন আর তা নেই, গেলাস তো আনেই না, কেউ কেউ পান আনে কিন্তু অত দেখিয়ে দেখিয়ে খায় না।"[৩] মেয়ে-যজ্ঞি বা মেয়ে-মজলিসের গতে বাঁধা নিয়ম অর্থাৎ নিমন্ত্রিতদের জন্য 'বাঁধা আদর'- তাদেরকে পালকি থেকে তুলে ভেতরে নিয়ে যাওয়া, খাবার সময় ডেকে নিয়ে যাওয়া আর খাবার শেষে গিন্নির দর্শন দেওয়ার ঘটনাগুলোতে যে ত্রুটি হবার জো নেই- তা জানিয়ে তিনি এও বলেন যে, সকলে এক রকম নন। 'পাল্কী ওঠা'র বিষয়টি শরৎকুমারী বেশ রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করেছেন। নিজের অভিজ্ঞতার ছবি বলে তা বেশ উপভোগ্যও হয়েছে এবং এই ঘটনা থেকে বিভিন্ন নারীর মানসিক রূপ বা স্বভাবের পরিচয় আমরা পাই। যেমন, "বাড়িতে শাশুড়ি যদি বউয়ের গলার স্বরটি শুনতে পান তো রেগে বাড়ি মাথায় করেন- কিন্তু পালকিতে উঠবার সময় যদি সেই বউয়ের গলা শোনেন- তাতে বউয়ের কিছুমাত্র লজ্জার ত্রুটি দেখেন না, তাতে তাঁর রাগ হয় না- বরং বউকে পালকি ধরবার জন্য চেঁচামেচি করতে উত্তেজনা করা হয়।"[৪] লেখিকা যে সরা পেয়েও বেঁধে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন না- এই ঘটনা শুনে স্বয়ং নিমন্ত্রণকারিণী কর্ত্রীও অবাক হয়ে যান। এতে সেই চিরন্তন সত্যই প্রকাশ পায় যে, সামাজিক নিয়ম যত খারাপই হোক না কেন, মানুষ তাতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সেই ব্যাপারে তার ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানও লোপ পেয়ে যায়।

'মেয়েযজ্ঞির বিশৃঙ্খলা' (পৌষ, ১৩১৬) প্রবন্ধে একটানা, ঝরঝরে ভাষায় বিভিন্ন নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রণকারীদের আচরণগত নানা অসঙ্গতিকে তুলে ধরার পাশাপাশি আমাদের সমাজের বহুবিধ নিয়ম ও তার সুফল-কুফলের প্রতিও পাঠকের দৃষ্টি শরৎকুমারী আকর্ষণ করেছেন। তাঁর লেখার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর সহজ ভাব, অভিজ্ঞতা-প্রসূত জীবনের নানা জীবন্ত বর্ণনা। পরিণত বয়সে নিজের ইচ্ছেয় প্রবন্ধ লিখতে বসে নিজের সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, সমাজে মেয়েদের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও নিজের মত প্রকাশ করেছেন লেখিকা। পিতা, স্বামী, পুত্রকে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করা, যোগ্য গৃহলক্ষ্মী হয়ে ওঠাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় কাজ বলে তিনি মনে করেন, তবুও নারী-শিক্ষার মূল সমস্যাটিকেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন, "বর্ণ পরিচয়ের জ্ঞানশূন্যা স্ত্রীলোক হাজারে একটীও মিলিবে না– কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালী রমণীর উন্নতি কতটুকু হইয়াছে?....সেই কথামালা, বোধোদয় পড়াই শেষ পড়া। সেই তের/চোদ্দ বৎসর বয়সে বালিকা মা হইয়া শিশুপালনের ভার গ্রহণ করে। সে যে তখনও নিজেও মানুষ

হয় নাই– সে আবার অন্যকে মানুষ করিবে কি?"[৫] এই শিক্ষার প্রণালী না বদলালে বাস্তবিক নারী-উন্নতি সম্ভব নয়– এই সারটুকু তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন।

উৎসবের দিনে নানা আলাপচারিতা, মেয়েদের সাজপোশাক, সন্তানকে নিয়ে নিমন্ত্রণ বাড়িতে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া, কলহ, মন-কষাকষি, মহিলাদের একের অপরের সম্বন্ধে বিচিত্র মানসিকতা- সমস্তই অতি সহজ-সরল ভাবে বলে গেছেন লেখিকা। উৎসব বাড়িতে বিলি-ব্যবস্থার চূড়ান্ত অরাজকতা– তবে তার মধ্যেই একটি ব্যাপারে তিনি খুশি– ওই সব অনুষ্ঠানে খাবার বাঁধাছাঁদার ব্যাপারটি ক্রমে বন্ধ হয়েছে বলে।

প্রসঙ্গতঃ তিনি সমকালীন মহিলাদের সাজপোশাকের উন্নতির কথা বলেছেন। মেয়েদের সংস্কার-মুক্তির প্রসঙ্গ যেমন তিনি এনেছেন, তেমনি অল্প বয়সী মায়ের বহু সন্তানকে সামলানোর অক্ষমতাকেও তুলে ধরেছেন। কথায় কথায় মেয়েদের তুলনায় পুত্র-সন্তানের প্রতি আদরের অতিরেকের চিত্রটিও এখানে আমরা পাই। মেয়েদের মধ্যে গৃহস্থালির কাজকর্মে অনীহার বিষয়টিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। নারী সমাজের প্রকৃত উন্নতি, কাজেই, তাঁর মতে তেমন হয়নি। ড. জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় শরৎকুমারীর এই প্রবন্ধ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তাতে লেখিকার মনোভাব স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে, "বিশেষ ভাবনা ও উদ্দেশ্য নিয়েই এ প্রবন্ধে তিনি লিখছেন যে, সুশিক্ষিত নারীরা এই প্রবন্ধ পাঠ করে যদি নারী কল্যাণে, নারীর উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হন তবেই তার কলমের সার্থকতা।"[৬]

এই প্রবন্ধের অনুবৃত্তি হিসেবে অগ্রহায়ণ, ১৩১৭-তে তিনি 'মেয়ে-যজ্ঞি' নামক প্রবন্ধটি লেখেন। ভূমিকায় তিনি বলেন আগের প্রবন্ধটি লেখার জন্য আত্মীয়স্বজনের বাক্যবাণে নিজের আক্রান্ত হওয়ার কথা। এখানে তিনি পাঁচটি পত্র 'ভারতীর পাঠক-পাঠিকার গোচরার্থ' প্রকাশ করেছেন। এগুলো তাঁর প্রবন্ধের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। তবে এই চিঠিগুলোর বক্তব্য বেশ গোছানো এবং লেখিকাদের ভাষাও বেশ সহজ-সরল ও স্পষ্ট। ব্যঙ্গাত্মক পত্রগুলোয় লেখিকারা "শরৎকুমারীকে একপেশে সমালোচক বলে মনে করেছেন।"[৭] আর এই পত্রগুলো প্রকাশের মাধ্যমে শরৎকুমারীও নিজের মনের স্বচ্ছতা বজায় রেখেছেন। সুলিখিত এই প্রবন্ধ দুটোয় তৎকালীন নারী-সমাজের বাস্তব চিত্রটি স্পষ্টভাবে আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে।

১২৯৮, আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত শরৎকুমারীর 'শ্বাশুড়ি-বৌ' প্রবন্ধটি লেখিকার আগ্রহব্যঞ্জক রচনাশৈলীর আরেকটি নমুনা। বাঙালির মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের শাশুড়ি-বউয়ের চিরন্তন সমস্যা নিয়ে এখানে কলম ধরেছেন তিনি। প্রথমেই শরৎকুমারী শাশুড়িদের বধূর প্রতি বিরূপ মনোভাব ও উষ্মার কথা বলেছেন। বিষয়টি যে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি, তা অবশ্য বেশিরভাগ সময়ই তাদের মনে থাকে না। অথচ শাশুড়ি ও পুত্রবধূর সম্পর্ক অতি মধুর হয়ে উঠতে পারে স্বভাব ও আচরণের একটু হেরফেরেই। কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীত চিত্রই বেশি দেখা যায়। বধূ-বরণের সময় থেকেই শাশুড়ি বউয়ের প্রতি বিরূপতা পোষণ করতে থাকেন। এর কারণ ছেলের জন্মের পর থেকেই হৃদয়ে পোষণ করে থাকা নানা স্বর্ণালি স্বপ্ন- যার প্রায় সবটা জুড়ে থাকে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্বের কল্পনা। কিন্তু বাস্তবের চিত্র যখন অন্যরকম হয়ে ওঠে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, হয়তো বা একটি দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে চাহিদার চেয়ে অনেক কম অলংকার ও দানপত্র নিয়ে গৃহ প্রবেশ করে তখনই শুরু হয় সমস্যা। রূপের প্রশ্নেও, বধূ প্রায় কখনোই শাশুড়ির মন জয় করতে পারে না। ওই নবাগতা, সদ্য পিতা-মাতার আশ্রয় ছেড়ে আসা মেয়েটির ভয়ার্ত মানসিকতাও এখানে লেখিকা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিবাহে বর-পণের বিষয়টিই মূলত শাশুড়ির বউয়ের প্রতি বিরূপতার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার পুত্র ও পুত্র-বধূর সুমধুর সম্পর্কও বেশিরভাগ শাশুড়ির চক্ষুশূল। বধূ অবস্থায় তিনি যখন নিজের শাশুড়ি কর্তৃক অত্যাচারিত হয়েছেন, তখন নিজের বউকে মেয়ের সমান স্নেহ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা যাঁরা করেন, সময়কালে সেই শপথ ভুলে তারাও চিরাচরিত শাশুড়ি হয়ে ওঠেন। অথচ "বধূকে নিজ সন্তানের মত মনে করাই কর্ত্তব্য, সুন্দর কুৎসিত সন্তান মায়ের নিকট যেমন সমান আদরের, তেমনি কুৎসিতা বধূকেও আদর করিয়া লইলে ভবিষ্যতে শ্বশ্রূ ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্রী হইতে পারেন। বরং দুহিতা পর হইয়া যায়, বধূই গৃহলক্ষ্মী নামে অভিহিত হন।"[৮] একই শাশুড়ি পুত্রবধূ ও জামাতার বেলায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়ে থাকেন– জামাই আদর-যত্নের আতিশয্যে তাঁকে মা বলে ভাবে, পাশাপাশি বধূ লাঞ্ছিত হয়ে তাঁকে বাঘিনী মনে করে। অথচ শ্বশ্রূ-বধূ সম্পর্কটিতে থাকা উচিত ভালোবাসা, পরস্পর নির্ভরশীলতা, স্নেহ ও যত্ন এবং ভক্তি। প্রবীণার তরফ থেকে যত্ন নেওয়া শুরু হলে নবীনার মনেও যত্নের ভাব ও ভক্তি সঞ্চারিত হতে পারে। রচনাটিতে অভাগিনী বালিকা-বধূদের প্রতি লেখিকার সমবেদনা ও ভালোবাসা হৃদয়স্পর্শী রূপ নিয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, শরৎকুমারীর রচনাশৈলী অত্যন্ত সাবলীল এবং বাস্তব-অভিজ্ঞতা-প্রসূত। শাশুড়ি ও বউয়ের গৃহস্থালীর নানা চিত্র তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা কালে প্রসঙ্গক্রমে লেখিকা মহাভারতের কুন্তী ও দ্রৌপদীর সম্পর্কের মিষ্টতার কথা উল্লেখ করেছেন। বধূকে যত্ন-স্নেহের পাশাপাশি শিক্ষা দেওয়াও শাশুড়ির কর্ত্তব্য— কথাটিকে তিনি মহাকাব্যিয় চরিত্র দুটির কার্যকলাপ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই বুঝিয়েছেন। কুন্তী যেমন দ্রৌপদীকে ভালোবেসেছিলেন, পুত্রদের দ্যুতক্রীড়ায় পরাজয়, রাজ্য হরণ ও পুত্রগণের নির্বাসন অপেক্ষাও উন্মুক্ত সভাস্থলে দ্রৌপদীর অপমানে যেমন দুঃখ পেয়েছিলেন, কৃষ্ণাও শাশুড়িকে ততটাই ভক্তি ও যত্ন করতে শিখেছিলেন। মহাভারতে বর্ণিত এই সম্পর্কটির মাধুর্য যদি আমাদের ঘরে ঘরে শাশুড়ি-বউয়ের মধ্যে থাকত, তাহলে দৈনন্দিন সংসার মধুরতম স্বর্গে পরিণত হতো। আমাদের পৃথিবী আরো সুন্দর হয়ে উঠতো।

কালের পরিবর্তনে ও বিদেশী শাসকের অধীনে থেকে অন্যরকম সংস্কৃতি ও উন্নতির স্বাদ আমরা পেয়েছি, কাজেই সমাজের সঙ্গে সঙ্গে তাতে বসবাসকারী মানুষেরও পরিবর্তন হয়েছে। নব্য পুরুষ সম্প্রদায় ইংরেজদের দেখে মুগ্ধ এবং সেই রকম হওয়ার চেষ্টাতেই ব্যগ্র। আর এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের বাঙালি যুবকদের রুচি রীতিনীতি আচার-ব্যবহার অনুসারেই সমকালের মেয়েরা গঠিত হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করেছেন শরৎকুমারী তাঁর 'একাল ও একালের মেয়ে' (ভারতী ও বালক, মাঘ, ১২৯৮) প্রবন্ধে। আগেকার দিনের পোষাক-পরিহিতা ও রুচিসম্পন্না মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নেওয়া এখনকার ছেলেদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও, অতীতের মেয়েদের গুণাবলী স্মরণ করে এ যুগের মেয়েদের প্রতি পুরুষ খড়্গহস্ত।

শরৎকুমারী দেখিয়েছেন, দূর থেকে দেখা সুন্দর পল্লীর ছবি-সদৃশ কুঁড়ে ঘরে থাকা যেমন শহুরে মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি পূর্ণরূপে সেকালের মেয়েদের মত হলে একালের মেয়েদেরকে নিয়ে সংসার করা নব্য যুবকদের পক্ষে অসম্ভব বোধ হতো। স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধীর সংখ্যা কম নয় সমাজে, তবুও যে ছোট ছোট মেয়েদেরকে একটু লিখতে পড়তে শেখানো হয়– তা বিয়ের বাজারে তাকে যোগ্যতর করে তোলার জন্যই। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত বর অশিক্ষিত কনের কথা শুনলে দুঃখ পান। লেখাপড়া যদি আবশ্যক হয়েই দাঁড়ালো, তাহলে মেয়েদের ভাব ও রুচির পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবেই- লেখিকার মতে এটাই বাস্তব।

'অন্তঃপুর প্রসঙ্গ/লক্ষ্মীর শ্রী' রচনাটি প্রকাশিত হয় পৌষ, ১৩১৭ সংখ্যায়। সেখানে তাঁর আক্ষেপ, "আচার অনুষ্ঠানের ত্রুটির দিকে যেমন আমাদের খর দৃষ্টি অপরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি একেবারেই নাই।"[৯] সাধারণ বাঙালি- তা সে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত বা ধনী-যাই হোক না কেন, দৈনন্দিন শারীরিক ও গার্হস্থ্য পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়াকে যে বাহুল্য মনে করে-সেই বিষয়ে লিখতে গিয়ে প্রাত্যহিক জীবনকে খুব সহজভাবে তুলে ধরেছেন শরৎকুমারী। বরং তিনি ফিরিঙ্গিদের পরিচ্ছন্নতার মনোভাবকে প্রশংসা করেছেন। এই অপরিষ্কার মানসিকতা বাল্যকাল থেকেই যেহেতু মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে, কাজেই শিশুকাল থেকে ছেলেমেয়েদের মনে পরিচ্ছন্নতার বোধ জাগিয়ে তোলা উচিত। এর জন্য প্রয়োজন স্বল্প আয়াস ও স্বল্প ব্যয়। আর মানসিকতা তৈরি করে দিতে পারেন বাড়ির মেয়েরা বা মায়েরা- 'সকড়ির বিচার' ও 'শুচির আচারের' সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা মেলালে প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরই সৌন্দর্যময় হয়ে উঠতে পারে। ড. জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে বলেন, "রচনাটি আজও প্রাসঙ্গিক। শরৎকুমারীর সংসার ও সমাজের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রশংসনীয় ও উপযোগী।"[১০]

ফাল্গুন, ১৩২০ সংখ্যায় শরৎকুমারী লেখেন 'নারীশিক্ষা ও মহিলাশিল্পাশ্রম' নামক রচনা। তাঁর ভাষায় রয়েছে এক সুললিত সহজভাব, অনবদ্য সরলতা। ঝরঝরে, স্পষ্ট ভাষায় ও ভাবে নিজের অন্যান্য রচনার মতোই এখানেও স্বচ্ছন্দ তিনি। ১২৯৩ সালের বৈশাখে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন সখি-সমিতি, যার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের মধ্যে আলাপ-পরিচয়, দেখাশোনা, মেলামেশা, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার ও উন্নতির চেষ্টা- বিধবা রমণীকে সাহায্য ও অনাথাকে আশ্রয়দান ইত্যাদি। কয়েক বছর অসম্ভব উৎসাহ ও ধৈর্য সহকারে নানা বিঘ্ন-বিপত্তির মধ্য দিয়ে সমিতি চালিয়ে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তারপর অল্প দিনেই সখি-সমিতি লোপ পায়। সেইসব স্বর্ণালী দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে শরৎকুমারী বিশেষভাবে বলেছেন শিল্পমেলার কথা। শুরুতে তিনি এই ধরনের সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের প্রতি নিজেদের, বিশেষ করে শ্রীমতি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর অনুরাগের কথা বলেছেন। তবে স্বর্ণকুমারী দেবীর কর্মদক্ষতা, মানবানুরাগের কাহিনী তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

তবে সখি-সমিতি নয়, এখানে শরৎকুমারীর মূল লক্ষ্য স্বর্ণকুমারী-কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী-স্থাপিত মহিলা শিল্পাশ্রমের কথা বলা। সখি-সমিতির একটি উদ্দেশ্য বিশেষভাবে গ্রহণ করেই এই আশ্রম স্থাপন করেছেন তিনি। এই প্রবন্ধ রচনাকালে ৩০ জন ছাত্রী ছিল সেখানে। তারা বিভিন্ন জিনিস, যেমন ঝাড়ন, গামছা, শাড়ি, রেশমি কাপড়, মোজা, গেঞ্জি, লেস, নানা রকম বস্ত্র তৈরি করতে শিখেছে। এরকম সেলাই ফোঁড়াইয়ের শিক্ষা ঘরে ঘরে মেয়েদের থাকা প্রয়োজন বলে লেখিকা মনে করেন। আরও জানিয়েছেন, শুধু বিধবারাই নয়, সধবা নারীও এখানকার ছাত্রী হয়ে তাঁত বোনা বা আধুনিক পোশাক তৈরিতে পারদর্শী হতে পারে।

তবে এ হেন মহৎ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের ছাত্রী-সংখ্যা, আর্থিক অবস্থা কিছুই আশাব্যঞ্জক নয় বলে লেখিকা আন্তরিক আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। আমাদের সমাজ মেয়েদের বাল্য বিবাহের বিধান দিয়েছে, যে কোনো বয়সের বিধবাদের জন্য কঠোর নিয়ম, চির অন্ধকারময় এক বদ্ধ জীবনের ব্যবস্থাপনা করেছে- বর্বর প্রথার যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছে, তার জন্য খোলা রাখেনি এক চিলতে আকাশও। ঊনবিংশ শতকে এদের দুরবস্থায় একান্ত ব্যথিত ও মমতা-পরবশ হয়ে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন, আত্মীয় স্বজনের চির গলগ্রহ, 'অকল্যাণী' রূপে চিহ্নিত এদেরকে জীবনের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করতে চেয়েছেন। কিন্তু সমাজের মন

তাতে গলেনি। মহিলাশিল্পাশ্রমের অতি নগন্য মাসিক চাঁদা জোগাড় করাও দিনে দিনে অসম্ভব হয়ে পড়েছে, ছাত্রী-সংখ্যাও বৃদ্ধি পাওয়ার বদলে কমে গেছে। কারো কাছ থেকে স্নেহ না পেয়ে ঘরে ঘরে চলে বিধবাদের নিরানন্দ জীবনস্রোত। পেটের দায়ে অনেককে সমকালে হীনকার্য্যে জীবিকা অর্জনের পথে যেতে হচ্ছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই, তাদের মনে আসছে নীচতা। "যে রমনী আজ ভ্রাতৃগৃহে স্থান পাইলে একাহারে অক্লান্ত পরিশ্রমে হাস্যমুখে ধর্ম্মকর্ম্মে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত– সে রাঁধুনিবৃত্তি গ্রহণে কেমন করিয়া তেলটুকু সরাইব, কেমন করিয়া নুনটুকু সরাইব এই চেষ্টায় বিব্রত থাকে।"[১১] আমাদের দেশে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া অনিবার্য কাজ, আর নাবালিকার ক্ষেত্রে, তার মনে বিয়ের দিনের স্মৃতি না থাকলেও বিধবাবস্থায় তাকে জীবনের কঠোর কণ্টকময় পথে অবিশ্রান্ত হাঁটতে হবেই। অথচ পশ্চিমের দেশগুলোতে কত মহীয়সী কুমারী নারীর কথা শোনা যায়। অসহায় ভারতীয় মেয়েদের জন্য এখানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন লেখিকা।

'মহিলাশিল্পাশ্রম' একটি মহৎ প্রয়াস, অথচ দিনে দিনে তা হতাশা, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে চলেছে। সামাজিক মানসিকতা বিশ্লেষণ করে এই প্রসঙ্গে শরৎকুমারী বলেন যে, উন্নতির চিন্তা করে দেশের জনসাধারণ মেতে উঠলেও প্রথমে গাছটির যত্ন করলে তবেই যে ফলটি ভালো পাওয়া যায়, তা বুঝতে পারেননি। তবুও, আশাকে বাঁচিয়ে রাখা মানুষের ধর্ম, তাই লেখিকা শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের শুভবুদ্ধির কাছেই আবেদন রেখেছেন হিরণ্ময়ী দেবীর এই প্রয়াসকে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য।

মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ত্রিপুরার রাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং 'ভারতী'র তৎকালীন সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী বলেন, "এমন দানশীল, সহৃদয়, পরদুঃখকাতর, সরলচেতা অমায়িক রাজা প্রায় দেখা যায় না। সেকালের রাজাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ গল্পকথা শুনা যায় ইহাতে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাইত।"[১২] বঙ্গ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এই বিনয়ী রাজার গুণাবলী অল্প কথায় এই সংখ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন 'জনৈক সুপরিচিত মহিলা (শ্রীমতী)' "স্বর্গীয় ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য" নামক রচনায়। এই সুপরিচিত নারী যে শরৎকুমারী, তা আমরা আন্দাজ করে নিতে পারি। শরৎকুমারী কয়েকবার ত্রিপুরায় গেছেন, মহারাজার স্নেহধন্যাও ছিলেন তিনি। তাছাড়া ঠাকুর পরিবারের নিজস্ব পরিমণ্ডলের মধ্যে যে 'খেয়াল খাতা' বা 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' প্রচলিত ছিল, তার উল্লেখও এই রচনায় থাকায় আমাদের এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হয়। তাছাড়া শ্রীযুক্ত সুনীল দাস মহাশয়ের 'ভারতী : ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী' গ্রন্থেও এই মতকেই সমর্থন করা হয়েছে (পৃ. ২৯৭)। রচনাটিতে লেখিকা নিজের হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন মহারাজের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। বিদ্যার প্রতি অনুরাগী ছিলেন তিনি, নানা পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর। ধর্মপ্রাণ রাজা সধবা কুমারী পুজো করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যাপকদের সসম্মানে বিদায় দান করেন, ফলে অধ্যাপকেরা প্রীত হয়ে তাকে 'ধর্ম্মার্ণব' উপাধি দিয়েছিলেন– একথাও লেখিকা জানিয়েছেন। উপসংহারে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহারাজ-স্মরণে যে গান রচনা করেছিলেন, তার উল্লেখও করেছেন।

'অনন্তগুণের আকর' সেই মহারাজার ঐহিক গুণাবলীর বিস্তৃত বর্ণনা সহকারে "স্বর্গীয় ত্রিপুরাধীশ্বর মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম ধর্ম্মার্ণব মাণিক্য বাহাদুর" (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬) নামক শোকসন্তপ্ত বার্তাটিও রচনা করেন শরৎকুমারী চৌধুরাণী। মহারাজের শিক্ষা, নানা বিষয়ে পাঠানুরাগ, ধর্মভাবুকতা, ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, বিভিন্ন ভাষার প্রতি অনুরাগ ও ভাষাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি, সঙ্গীত ও চিত্রকলাবিদ্যায় বিশেষ নিপুণতা, কবিত্ব-শক্তির মাধুর্য

প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা লেখিকা বিস্তৃতভাবে করেছেন। লেখিকার ভাষা, রচনাশৈলী যথার্থভাবেই মহারাজার প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শোকার্ত মানসিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। ১২ বৎসরের রাজত্বকালে মহারাজের নানা কীর্তি, প্রজানুরাগ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, প্রজাদের উন্নতিকল্পে তৈরি নানা স্থাপত্য-যেমন হাসপাতাল, স্কুল, বোর্ডিং, নানা রমণীয় সৌধ, দীঘি, সুপ্রশস্ত রাজপথ, বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সজ্জিত শোভাময় আগরতলার স্বর্গীয় সৌন্দর্য প্রভৃতির কথা অতি যত্নের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। প্রবন্ধের শেষে বর্তমান মহারাজা স্বর্গীয় রাধাকিশোর মাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র 'পঞ্চশ্রীযুক্ত' বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুরের দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করতেও তিনি ভোলেননি।

উপসংহার

শরৎকুমারী চৌধুরাণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী, ঠাকুরবাড়ির পরিমণ্ডলেই ছিল তাঁর বেশির ভাগ চলা-ফেরা। সাধারণ বিষয় দিয়ে লেখা শুরু করে অন্য বিষয়ে, তা থেকে বিষয়ান্তরে গিয়েছেন তিনি। তাঁর সেই সাহিত্য-সাধনার পথ কেমন ছিল, তা-ই হল আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। একবিংশ শতকে বহু যোজন এগিয়ে এসেছে নারী-সাহিত্যিকের রচনাশৈলি, বিশ্বায়ন ঘটেছে তাঁদের মননে। এই ক্রমাণ্বয়ী যাত্রার উৎসস্থলে ফিরে যাওয়ার চেষ্টাতেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের লেখিকাদের মন-মানসিকতা, লেখনী, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এসেছে। সেই অবশ্যম্ভাবী দায়িত্ববোধ থেকেই এই রচনাটির অবতারণা।

তথ্যনির্দেশ

১. ভারতীর ভিটা ও শরৎকুমারী চৌধুরাণী, কুরুক্ষেত্র বইমেলা সংখ্যা ১৪২১, সম্পাদনা, সুজন গুপ্ত; কলকাতা, জানুয়ারী, ২০১৫, পৃ ২২।

২. তদেব, পৃ ২৩।

৩. কলিকাতার স্ত্রী সমাজ, ভারতী, ভাদ্র, ১২৮৮, পৃ ২৩৬।

৪. তদেব, পৃ ২৩৭।

৫. মেয়েযজ্ঞির বিশৃঙ্খলা, ভারতী, পৌষ, ১৩১৬, পৃ ৪৮৩।

৬. ভারতীর ভিটা ও শরৎকুমারী চৌধুরাণী, কুরুক্ষেত্র বইমেলা সংখ্যা ১৪২১, সম্পাদনা, সুজন গুপ্ত; কলকাতা, জানুয়ারী, ২০১৫, পৃ ২৭।

৭. তদেব।

৮. শ্বাশুড়ী-বৌ, শরৎকুমারী চৌধুরানী, ভারতী ও বালক, আষাঢ়, ১২৯৮, পৃ ১৫৩।

৯. অন্তঃপুর প্রসঙ্গ: লক্ষ্মীর শ্রী, শরৎকুমারী চৌধুরানী, ভারতী, পৌষ, ১৩১৭, পৃ ৭৮৯।

১০. ভারতীর ভিটা ও শরৎকুমারী চৌধুরাণী, কুরুক্ষেত্র বইমেলা সংখ্যা ১৪২১, সম্পাদনা: সুজন গুপ্ত; কলকাতা, জানুয়ারী, ২০১৫, পৃ ২৮।

১১. নারীশিক্ষা ও মহিলাশিল্পাশ্রম, শরৎকুমারী চৌধুরানী, ভারতী, ফাল্গুন, ১৩২০, পৃ ১১৯৩।

১২. ভূমিকা, স্বর্গীয় ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য, জনৈক সুপরিচিত মহিলা (শ্রীমতী), বৈশাখ, ১৩১৬, পৃ ২২।

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2023v5i2bg3
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -V, Issue-II, December 2023
Pp. 22-28

সমাজ পরিবর্তনে কীর্তন: একটি সমীক্ষা

ড. সুদেষ্ণা বণিক

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে সংগীত হল গীত, বাদ্য ও নৃত্য-এই তিনের সমন্বয়। ভারতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সুদূর অতীত কাল থেকে ধর্মীয় উপাসনার প্রধান অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হত এই সংগীত। কালে কালে এই সংগীত মূলতঃ দুটি ধারায় বিভক্ত হয়: ১) অভিজাত নাগরিক সংগীত ও ২) গ্রামীণ লোকসংগীত। এই সংগীত শুধু মানুষের সাংস্কৃতিক রুচিরই পরিচায়ক নয়, বরং সমাজের মধ্যকার অস্থিতিশীলতা, অরাজকতা, কুসংস্কার ইত্যাদি দূর করারও অন্যতম হাতিয়ার।

বাংলার নিজস্ব অভিজাত সংগীত হল কীর্তন, আর যুগে যুগে বাংলার সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই কীর্তনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সর্বপ্রথম সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে কীর্তনের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ করেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই পথের পথিক হন শ্রী নরোত্তম দত্ত ঠাকুর। মূলতঃ তাঁর প্রচেষ্টাতেই বিখ্যাত খেতরি মহোৎসব আয়োজিত হয় যেখানে কীর্তনের 'নিবদ্ধ গীতরূপ'-এর প্রচলন ঘটে এবং গরাণহাটি চালের কীর্তনের প্রবর্তন ঘটে। সেদিনের সেই মহোৎসব থেকেই কীর্তন গান 'অভিজাত নিবদ্ধ সংগীত'-এর মর্যাদা লাভ করে। কালক্রমে এই ধারার অনুসরণে সৃষ্টি হয় আরও চার প্রকার চাল বা রীতির কীর্তন– মনোহরসাহি, রেনেটি, মন্দারিনী ও ঝাড়খণ্ডী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন 'কবি গান' ও 'পাঁচালি গান'-এর প্রবল জনপ্রিয়তার কারণে কীর্তন গান তার আভিজাত্য হারাতে বসেছিল তখন সামগ্রিকভাবে কীর্তনকে বাঁচাতে, মানব সমাজে তার লোকপ্রিয়তা ফিরিয়ে দিতে সৃষ্টি হয়েছিল 'ঢপ কীর্তন'-এর। এই ঢপ কীর্তনের দ্বারা বাংলা কীর্তন গানের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনা এবং সর্বসাধারণে এই ঢপকে প্রবল জনপ্রিয় করে তোলার পেছনে মধুসূদন কিন্নর বা মধু কান নামক গায়কের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। মূলতঃ মধু কানের কৃতিত্ব ও প্রচেষ্টাতেই বাংলা কীর্তনের হারিয়ে যাওয়া জনপ্রিয়তা ফিরে আসতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তা সর্বসাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলা কীর্তন প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতীয় প্রবন্ধ গানের উত্তরসূরী যেখানে দেশজ লোক-সুরের ছোঁয়াও রয়েছে। এই কারণেই এই শৈলী যেমন গ্রামীণ মানুষের হৃদয় জয় করেছিল, তেমনই অভিজাত নাগরিক সমাজের কাছেও ছিল আদৃত। তাই বাংলা প্রায় সকল প্রকার গানের বিখ্যাত স্রষ্টারা (পঞ্চকবি সহ) নানান ভাবে তাঁদের গানে কীর্তনের প্রয়োগ করেছেন এবং এইভাবে তাঁরা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

ড. সুদেষ্ণা বণিক
পি. এইচ. ডি. (কণ্ঠসঙ্গীত, কীর্তন)
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: banik_sudeshna132.yahoocom

মূলশব্দ

সংগীত, সমাজ, সংস্কৃতি, কীর্তন, পরিবর্তন, সামাজিক ভূমিকা

ভূমিকা

ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে সংগীত হল গীত, বাদ্য ও নৃত্য-এই তিনের সমন্বয়। কবে, কোথা থেকে, কেমন করে এই সংগীতের সৃষ্টি হল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে বিভিন্ন গ্রন্থে সংগীতের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ উল্লিখিত আছে। আর, সবচেয়ে সমর্থিত সূত্রানুযায়ী প্রকৃতির বিভিন্ন সুরেলা শব্দকে অনুকরণ তথা অনুসরণ করেই মনুষ্য সমাজে সংগীতের প্রচলন ঘটেছে।

পদ্ধতি

এটি মূলত অনুসন্ধান ভিত্তিক রচনা। সংগীতের সাথে প্রকৃতি ও সমাজের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বিচার ও বিশ্লেষণকারী বিভিন্ন লেখা পর্যালোচনা করেই একটি সীমিত আলোচনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্লেষণ

ভারতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সুদূর অতীত কাল থেকে ধর্মীয় উপাসনার প্রধান অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হত এই সংগীত। কারণ, প্রাচীন কাল থেকে দেব-দেবী অথবা নরপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গুণ, কীর্তি তথা লীলার বর্ণনে কাব্যপদ (Verse) ও গেয়পদের (Lyric) ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যদিও সংজ্ঞানুযায়ী কাব্যপদ ও গেয়পদের কিছু বিভেদ ছিল, কিন্তু তৎকালীন রীতি অনুযায়ী প্রায় সকল পদই সুরে গাওয়া হত। আর এই সকল গানকেই 'পদগান' বলা হত যা রচয়িতা নিজেই সুর ও তালসহ গাইতেন। নির্দিষ্ট গীতশৈলী না থাকায় প্রাচীন পদগানকে 'প্রবন্ধ' বা গেয়পদ অর্থাৎ Composition বলা হত যা দু'ভাবে প্রযুক্ত হত– ১) নাট্যাশ্রিত অর্থাৎ নাটকের আকারে কাহিনী নির্ভর পদাবলী গান এবং ২) নাট্য বহির্ভূত কাহিনীর অংশবিশেষ নিয়ে একটিমাত্র পদে গান। দেশি রাগ সম্বলিত এই প্রবন্ধ ছিল 'অভিজাত সংগীত'-এর পর্যায়ভুক্ত। আবার গ্রামীণ মানুষের রুচি ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে সংগীত প্রচলিত ছিল তা গ্রাম্য বা 'লোকগীত'-এর পর্যায়ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে আপামর মানুষের সাংস্কৃতিক রুচির সাথে তাল মিলিয়ে প্রবন্ধ ও লোকগীতের মাঝামাঝি এক প্রকার সংগীতের সৃষ্টি হল যার নাম 'প্রকীর্ণ গান' তথা উপরাগসংগীত বা Classico Folk Song।

শিক্ষা যেমন মানব মস্তিষ্ককে পরিশীলিত করে, সংগীত তেমন মানব মনকে সুস্থিত করে। আবার, পারিপার্শ্বিক সমাজ ও পরিবেশ এই সংগীতকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করে। একইভাবে, সংগীতও সামাজিক বৈচিত্র্যকে এক সূত্রে গ্রথিত করে সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারংবার রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে যার ফলশ্রুতিতে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এখানে মধ্যযুগকে তুর্কি-মুসলিম শাসনামল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় যখন ভারতীয় কৃষ্টির সকল ক্ষেত্রেই একটা বিবর্তন ও পরিবর্তন চিহ্নিত করা যায়। এই সময় অর্থাৎ খ্রিস্টীয়

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বাংলা যখন মুসলমান শাসনে, তখন সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাঙালি বিদ্যার্থীরা সেই সময় ন্যায়-স্মৃতি-মীমাংসা পড়ার জন্য পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিথিলায় পাড়ি জমায় এবং বিদ্যার সাথে সাথে সেখানকার সংস্কৃতিরও একটা অংশ নিজেদের কণ্ঠ ও স্মৃতিতে ধারণ করে নিয়ে আসে এই বঙ্গে। আর এভাবেই বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে প্রবেশ করেন মিথিলার শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর যাঁর প্রভাবে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী ও সংগীত নব কলেবরে সজ্জিত হয়। অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুসলমান শাসনের ফলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি যতটা ক্ষতিগ্রস্ত ও স্থবির হয়েছিল, বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রভাবে তা অনেকাংশে কেটে গিয়েছিল।

কীর্তন যেহেতু বাংলার একান্ত নিজস্ব অভিজাত সংগীত, তাই বাংলার পরিবেশ ও সমাজ গঠন তথা সংরক্ষণে কীর্তনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে যতবার পরিবেশগত বা সামাজিক অস্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছে, ততবার দেশ ও দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে কীর্তন গান। জয়দেব গোস্বামীর 'শ্রীগীতগোবিন্দ' দিয়ে যার জয়যাত্রা শুরু, বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ঠাকুর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নরোত্তম দাস ঠাকুর পরবর্তী অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ সংগীতকারদের পেরিয়ে বর্তমানেও সেই যাত্রা অব্যাহত।

যদিও বাংলা কীর্তনের প্রচার, প্রসার ও সর্বজনগ্রাহ্যতার জন্য প্রধান কৃতিত্বের অধিকারী হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, কিন্তু তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেও বাংলায় কীর্তনের প্রচলন ও জনপ্রিয়তা ছিল। বাংলায় প্রাপ্ত প্রাচীন ইতিহাস, লিপি লেখন ও প্রত্ন-নিদর্শন অনুযায়ী খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকেই পূর্ব ভারতের পুরাণ ও লোকসাহিত্যে কৃষ্ণলীলা সুপরিচিত হয়ে উঠেছে এবং বিষ্ণু-লক্ষ্মী সংক্রান্ত কাব্য-কাহিনীকে পেছনে ফেলে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলাই মানব মনন অধিকার করেছে। মূলতঃ সেন রাজবংশের রাজত্বকালেই বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম ও কীর্তনের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল। রাজা লক্ষ্মণ সেন ছিলেন এই বংশের সর্বাধিক খ্যাতিমান শাসক এবং তিনি নিজে পরম বৈষ্ণব হওয়ায় তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায়ই বাংলা কীর্তন তথা পদাবলী কীর্তনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব গোস্বামী সর্বপ্রথম আদি রসের আধারে রাধা ও কৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে রচনা করেন "শ্রীগীতগোবিন্দ", যা বাংলা পদাবলী কীর্তনের প্রথম পথপ্রদর্শক হিসেবে স্বীকৃত। জয়দেবের রচনারীতিতে উৎসাহিত হয়ে পরবর্তীকালের বৈষ্ণব মহাজনেরা রাধাকৃষ্ণের লীলা সংক্রান্ত বহু পদ রচনা করেছেন যা যুগে যুগে আপামর বাঙালি সমাজকে আপ্লুত করেছে, ভক্তিরসে প্লাবিত করেছে।

বাংলা কীর্তন তথা বৈষ্ণব সাহিত্যের এই জয়যাত্রা বাংলায় মুসলমান অভিযানের প্রারম্ভিক যুগে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের সূচনালগ্নেও অব্যাহত ছিল। এই সময়ের প্রখ্যাত পদাবলীকারগণ হলেন– মালাধর বসু, বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ঠাকুর প্রমুখ। তাঁদের রচনা মহাপ্রভুকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, আর এই ভক্তিরসকেই তীব্রতর করে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম থেকেই বাংলায় ভিন্ন ধর্মের আধিপত্য ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের গোঁড়ামির ফলে সাধারণ বাঙালি হিন্দুর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। একদিকে জোর করে ধর্মান্তরীকরণ, অপরদিকে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের দাপট, দুই মিলে সাধারণ ও নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। আনুমানিক চব্বিশ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস নেন

এবং কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। ভীতু ও দুর্বল হিন্দু সমাজকে পুনর্জীবিত করতে তিনি হাতিয়ার করেন সংগীতকে। প্রধানত নাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমেই তিনি সর্বস্তরের হিন্দুদের একীভূত করার প্রয়াস পান। মূলতঃ তাঁর প্রভাবেই হিন্দু সমাজ উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে আবার এক পতাকাতলে দাঁড়াতে শেখে এবং নতুন করে বৈষ্ণব ধর্ম ও কীর্তনের জয় হয়। হিন্দুধর্ম সুদীর্ঘকালব্যাপী যে নেতা বা পথপ্রদর্শকের সন্ধান করছিল, মহাপ্রভু তার অবসান ঘটান। ভিন্ন ধর্মের আগ্রাসন ও নিজ ধর্মের জাত-পাতের বিভেদ মিটিয়ে সমাজে ঐক্য ফেরাতে তিনি প্রয়োগ করেন কীর্তন গানকে এবং তাঁর এই চেষ্টা ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। শুধুমাত্র ভক্তিরসাশ্রিত কীর্তন গানের সাহায্যে মহাপ্রভু পতনোন্মুখ হিন্দু সমাজকে রক্ষা করেন।

মহাপ্রভুর প্রভাবে বাংলা পদাবলী কীর্তন নব কলেবরে ভাবাবেগ আশ্রিত হয়ে নবযৌবন লাভ করে। চৈতন্য-সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর মহাজনেরা নবোদ্যমে ভক্তিরসাশ্রিত যে সমস্ত পদ রচনা করেন, তা শুধুমাত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে সর্বস্তরের পাঠক ও শ্রোতার মন জয় করে নেয়। মহাপ্রভুর আগে বৈষ্ণব পদাবলী গাওয়া হত ঠিকই, কিন্তু তার প্রকৃত গীতরীতি সম্বন্ধে জানা যায় না। চৈতন্যচরিতামৃত অনুযায়ী আমরা জানতে পারি যে বৈষ্ণব পদাবলীর গান মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় এই সমস্ত গায়ন শৈলীকে মনোহারিত্ব দেন মহাপ্রভুর শেষ জীবনের অন্তরঙ্গ পারিষদ ও সংগীত পারদর্শী স্বরূপ দামোদর। পরবর্তীকালে শ্রী নরোত্তম দত্ত ঠাকুর ও তাঁর মত আরও জ্ঞানী-গুণী সংগীত বিশারদদের চেষ্টায় বাংলা কীর্তন আরও নানান ধারা, উপধারায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

মহাপ্রভু যেমন করে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজকে একদিন নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন কীর্তন গানের সহায়তায়, তাঁর তিরোধানের পর সেই ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন বাংলা পদাবলী কীর্তনে অভিজাত গায়নরীতির স্রষ্টা শ্রী নরোত্তম দত্ত ঠাকুর। উত্তরবঙ্গের রাজশাহী জেলার অন্তর্গত গোপালপুরের জমিদার শ্রী কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র শ্রী নরোত্তম দত্ত যৌবনে গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবন যান এবং সেখানে বৈষ্ণবমতে দীক্ষা নিয়ে পরবর্তীতে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব রূপে স্বীকৃত হন। পরবর্তীকালে তিনি নিজ জন্মভূমি, রাজশাহীর অন্তর্গত গড়েরহাট বা গরাণহাট পরগণার খেতরি গ্রামে ফিরে আসেন এবং গ্রামপ্রান্তে একটি কুটির তৈরি করে সেখানেই বৈষ্ণবীয় সাধনকর্মে নিযুক্ত হন।

শ্রী নরোত্তম দত্তের আবির্ভাব ও অবস্থানকালে উত্তরবঙ্গে সনাতন ধর্ম প্রায় বিলোপোন্মুখ ছিল। সাধারণ মানুষ ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এছাড়াও ঐ অঞ্চলে তখন বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল যা সনাতন হিন্দু ধর্মকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছিল। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ থেকে মানুষকে উদ্ধারের নিমিত্ত অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসেন শ্রী নরোত্তম দত্ত ঠাকুর। আর এই কাজে তিনি হাতিয়ার করেন কীর্তন গানকে, আয়োজন করেন খেতরি মহোৎসবের। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে বৌদ্ধ ধর্মের কঠোর কর্মযোগ অপেক্ষা হরিনাম গান করা সাধারণ মানুষের কাছে অনেক সহজ ও আকর্ষক হবে। আধ্যাত্মিক সাধনার প্রেরণার সঙ্গে সংগীতের আনন্দ মিলে যে সাধারণ মানুষের মনকে সহজে আকর্ষণ করতে পারবে, তা নরোত্তম ঠাকুর অত্যন্ত ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। অতএব তিনি পাঁচটি বিগ্রহের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজন করেন খেতরি মহোৎসবের এবং এই মহোৎসবে কীর্তনের জন্য যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা যে কোন তর্ক-বিতর্কের চেয়ে

অধিক কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল।

এই খেতরি মহোৎসবে গৌড়মণ্ডলের সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায় আমন্ত্রিত হন এবং দেশ-বিদেশের বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত, গায়ক-বাদক ও নর্তকের দোল এখানে যোগদান করেন। এই উৎসবে নরোত্তম ঠাকুর প্রাচীন প্রবন্ধ গীতাশ্রয়ী এক অভিনব কীর্তন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। গান আরম্ভ হলে একজন গায়ক যথাক্রমে উদারা, মুদারা ও তারা-র স্বরগ্রাম অনুযায়ী নিম্ন থেকে উচ্চে সুর প্রক্ষেপণ করতে থাকেন। এরপর প্রধান গায়ক নরোত্তম ঠাকুরের গলায় মালা পরানো হয় এবং তিনি কোথা ও সুরের সার্থক মেলবন্ধনে 'নিবদ্ধ গীত' আরম্ভ করেন। উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলী কীর্তন পরিবেশনের এই অভিনব রীতিতে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হন এবং তাঁরা এই রীতিকে সাদরে গ্রহণ করেন। সেইদিন থেকে কীর্তন গায়নের এই রীতিই অভিজাত সমাজে আদৃত হয় এবং বর্তমানেও তা অনুসৃত হচ্ছে। কীর্তন পরিবেশনের এই বিশেষ রীতিই পরবর্তীতে গড়েরহাটি বা গরাণহাটী কীর্তন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীকালে এই ধারার অনুসরণে আরও চার রীতি বা চালের কীর্তন প্রবর্তিত হয়। এগুলো হল-মনোহরসাহি, রেনেটি, মন্দারিনী ও ঝাড়খণ্ডী রীতি যা বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত।

সাহিত্য ও সংগীত একটা সমাজের জনরুচির পরিচয় বহন করে। যে কোন সময় সমাজের অধিকাংশ মানুষের সাহিত্য ও সংগীত প্রীতি আমাদের সেই সমাজের আভিজাত্যের মাণদণ্ড বুঝতে সহায়ক হয়। তারই নিরিখে আমরা 'অভিজাত সমাজ' ও 'লোকসমাজ' নির্ধারণ করি। কখনো অভিজাত সমাজের রুচি লোকসমাজের পর্যায়ে নেমে আসে, আবার কখনো লোকসমাজ সংস্কৃতিমনস্কতায় অভিজাত সমাজের সমকক্ষ হয়ে ওঠে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন 'কবি গান' ও 'পাঁচালি গান'-এর প্রবল জনপ্রিয়তার কারণে কীর্তন গান তার আভিজাত্য হারাতে বসেছিল তখন সামগ্রিকভাবে কীর্তনকে বাঁচাতে, মানব সমাজে তার লোকপ্রিয়তা ফিরিয়ে দিতে সৃষ্টি হয়েছিল 'ঢপ কীর্তন'-এর। কীর্তনের সুস্পষ্ট ছায়া সম্বলিত এই ঢপ কীর্তনে একদিকে যেমন বৈঠকী রাগরাগিনী যথাযথভাবে অনুসৃত হত, তেমনই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সুরের বিশিষ্ট ভঙ্গি। গানের মাঝে মাঝে এখানে 'কৃষ্ণ কহিতেছেন' বা 'শ্রীমতি কহিতেছেন' ইত্যাদি কথাগুলি সুরারোপ করে বলা হত। এই ঢপ কীর্তনের দ্বারা বাংলা কীর্তন গানের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনা এবং সর্বসাধারণে এই ঢপকে প্রবল জনপ্রিয় করে তোলার পেছনে মধুসূদন কিন্নর বা মধু কান নামক গায়কের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের যশোর জেলায় এই অত্যন্ত প্রতিভাময় গায়কের জন্ম। নিজ প্রতিভা ও গায়কী বৈশিষ্ট্যে তিনি ঢপ কীর্তনকে অত্যন্ত মনোরঞ্জক ও প্রবল জনপ্রিয় করে তোলেন। মূলতঃ মধু কানের কৃতিত্ব ও প্রচেষ্টাতেই বাংলা কীর্তনের হারিয়ে যাওয়া জনপ্রিয়তা ফিরে আসতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তা সর্বসাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

কীর্তন যেহেতু ভক্তিভাব সম্বলিত গান, তাই এর লোকপ্রিয়তা সমাজের অধিকতর মানুষের ধর্মভাব বা মানবতাবাদের স্বাক্ষর বহন করে। ধরে নেয়া যায় যে, যে সমাজে বেশিরভাগ মানুষ ধর্মভীরু, সেই সমাজে অন্যায়, অবিচারের সংখ্যা নগন্য। তাই, বাঙালি সমাজে কীর্তনের প্রভূত জনপ্রিয়তা এই গোষ্ঠীর শান্তিকামী মনোভাবই প্রকাশ করে। কিন্তু যুগের সাথে পরিবর্তিত হয় মানুষের শিক্ষা, রুচি ও চাহিদা। যার ফলে অনেকসময় সমাজের স্থিতিশীলতা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। বাঙালি সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে যতবারই বাংলার সামাজিক

ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ অস্থির হয়েছে, ততবারই পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে কীর্তন গান।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে উনবিংশ শতকের বঙ্গ সমাজে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থানগত কারণে যে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়, বাংলা গানের ক্ষেত্রেও তার ছোঁয়া লাগে। এই সময়ের জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-কবিগান, আখড়াই, হাফ আখড়াই, যাত্রা ও নাটকের গান, শাক্তগীতি, পাঁচালি, ব্রাহ্মসংগীত, টপ্পা প্রভৃতি। আর কীর্তন গানের অভিনবত্বের কারণে এই গান বাংলা প্রায় সকল প্রকার গানকেই প্রভাবিত করেছে।

বাংলা কীর্তন প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতীয় প্রবন্ধ গানের উত্তরসূরী যেখানে দেশজ লোক-সুরের ছোঁয়াও রয়েছে। এই কারণেই এই শৈলী যেমন গ্রামীণ মানুষের হৃদয় জয় করেছিল, তেমনই অভিজাত নাগরিক সমাজের কাছেও ছিল আদৃত। কথা, সুর, তাল, ভাব এবং রস-সংগীতের সকল দিকেই এই গান বিশেষভাবে অভিনব। এই গানের সাথে একদিকে যেমন ধর্মীয় আবেগ জড়িত, তেমনই এর শিল্প-বৈশিষ্ট্যও অনন্যসাধারণ। তাই, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষই এই গীতশৈলীর প্রতি আকৃষ্ট। তাই বাংলা প্রায় সকল প্রকার গানের বিখ্যাত স্রষ্টারা নানান ভাবে তাঁদের গানে কীর্তনের প্রয়োগ করেছেন এবং এইভাবে তাঁরা সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঞ্চকবি-রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল নিজ নিজ সৃষ্টিতে কীর্তনের প্রয়োগ করেছেন। বাংলা গানের এই পাঁচ অমর স্রষ্টা নিজেদের গানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কীর্তনের প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলার একান্ত নিজস্ব এই অভিজাত গীতশৈলীর অনন্য রূপটিকে শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন, স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সমাজ সচেতন মানুষ মাত্রেই সমাজ সংস্কারে এই পাঁচ প্রতিভাধরের কৃতিত্ব জানেন ও মানেন। স্বাধিকার হোক বা স্বাধীনতা আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ রদ বা নির্ভেজাল দেশপ্রেম, সমাজের সকল ক্রান্তিলগ্নে এই মহান কবিরা ধরেছেন লেখনী, সৃষ্টি করেছেন অমর সংগীত। তাই তাঁরা যখন নিজ সৃষ্টিতে কীর্তনকে আশ্রয় করেন, তখন এই গানের বিশেষত্ব ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব সহজেই অনুমান করা যায়। মানুষের হতাশাগ্রস্ত মন, ক্লান্ত হৃদয়কে প্রকাশ করতে, মানব মনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, প্রেম, বিরহ ইত্যাদি ভাবসমূহ ফুটিয়ে তুলতে কীর্তনাঙ্গ সুর, কথা ও ভাবধারার আবশ্যিক প্রয়োগ এই গানের উপযোগিতা প্রমাণ করে। তাই কবিগুরুর লেখনীতে যখন সৃষ্টি হয়, "না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে.....", আমরা অবাক হয়ে দেখি, কি চমৎকারভাবে তিনি মানব মনের চিরন্তন আকুতিকে প্রকাশ করেছেন! যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বলেন, "আমি সারা সকালটি বসে বসে এই সাধের মালাটি গেঁথেছি..." বা রজনীকান্ত লেখেন, "(আমি) অকৃতি অধম ব'লেও তো, কিছু কম ক'রে মোরে দাও নি.....", তখন সেখানে মানব মনের চির ব্যাকুলতা, প্রেম ও অপেক্ষার প্রকৃত স্বরূপটিই উন্মোচিত হয়। আবার যখন অতুলপ্রসাদ বলেন, "ওগো সাথী, মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে.....", তখন প্রেমিক হৃদয়ের চিরন্তন বাসনা ফুটে ওঠে। কাজী নজরুল যখন লেখেন, "রাধা তুলসী, প্রেম পিয়াসী, গোলোকবাসী শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ.....", তখন মানব মনের চিরন্তন সমর্পণের ভাবনাই যেন মূর্ত হয়ে ওঠে।

উপসংহার

কীর্তন এইভাবেই যুগে যুগে মানব মনের আর্তি প্রকাশ করেছে, মানব হৃদয়কে করেছে দ্রবীভূত। কীর্তনের প্রভাবে সামাজিক ব্যবধান ঘুচে গিয়ে মানুষে মানুষে নতুন করে তৈরি হয়েছে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। অন্ধকার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে সরল বিশ্বাসের পথে আনতে, আলোর পথে আনতে মণীষীরা বারংবার হাতিয়ার করেছেন এই কীর্তন গানকে। তাই, কীর্তন শুধু বাংলা সংগীতকেই মহিমান্বিত করেনি, বরং বারবার বাংলার সমাজকে করেছে স্থিতিশীল ও শান্ত, সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে করেছে অগ্রগামী। তাই কীর্তন সংগীতের কাছে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ, সকলেই চিরঋণী।

তথ্যনির্দেশ

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড)। কলিকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলিকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬-০৭।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড- প্রথম পর্ব)। কলিকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯-১০।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড- দ্বিতীয় পর্ব)। কলিকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯-১০।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (চতুর্থ খণ্ড)। কলিকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০।

৬. বণিক, সুদেষ্ণা। সঙ্গীতে বাংলা কীর্তনের প্রয়োগরীতি- দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গান। কলকাতাঃ নক্ষত্র প্রকাশন, ২৬ জানুয়ারি ২০১৫।

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2023v5i2bg4
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -V, Issue-II, December 2023
Pp. 29-38

বয়ঃসন্ধির ট্রানজিট পিরিয়ডঃ প্রসঙ্গ অসমিয়া ঔপন্যাসিক ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার কিশোর উপন্যাস 'মরমর দেউতা'

জাহ্নবী দাশ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য

জাহ্নবী দাশ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
লামডিং কলেজ, অসম, ভারত
e-mail: dbjjahnabi@gmail.com

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত
e-mail : brjsanjay24×7@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ছোটদের পৃথিবীটা যেহেতু বড়োদের মতো কূট– কাচালিময় নয়, তাই তাদের বিশ্বাসের জগতটাও অত্যন্ত গভীর। নিজস্ব কিছু নিয়মকানুন তাদেরও আছে। বড়োদের চেয়ে আলাদা হলেও যুক্তি বা বুদ্ধি তাদের নেই এটা ভেবে নেওয়াটা মারাত্মক অপরাধ ছাড়া আর কিছু নয়। যেহেতু ছোটদের মন ভীষণ নরম-সরম, যেমন খুশি তাদের গড়ে তোলার একটা সুযোগ থেকেই যায়। এই মন ও চিন্তন সঠিকভাবে গড়ে তোলার অনেকটা দায়িত্ব বর্তায় শিশু সাহিত্যের ওপর। অসমিয়া উপন্যাস 'মরমর দেউতা'য় কৈশোরের যে টানাপোড়েন ও সংকটের কথা উঠে এসেছে, এই গবেষণায় তার মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

মূলশব্দ

কৈশোর, একাকীত্ব, মনস্তত্ত্ব, ডিটেলস, বিশ্বাস

ভূমিকা

ছোটদের মন ও মনন গঠনে অপরিসীম ভূমিকা থাকে সাহিত্যের। তবে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে শিল্প-সাহিত্যের রূপগত,ভাবগত, আঙ্গিকগত বদলের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেছে শিশু-কিশোর সাহিত্যের ফর্মটাও। উঠে এসেছে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা। রূপকথার রহস্যময় আলো আঁধারির বদলে সায়েন্স ফিকশনেই মগ্ন হতে স্বচ্ছন্দ জেনারেশন 'জেড'। তাই শিশু বা কিশোর সাহিত্য মানে আর 'সদা সত্য কথা কহিবে' বা 'চুরি করা বড় দোষ' মাত্র নয়। মনের ভেতর যে ভালো দিকগুলি ঘুমিয়ে আছে, তাদের পুষ্ট করাও। মর্যাদা দেওয়া তাদের ভাবনা চিন্তা, জীবন সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকেও। আজকের যুগটা, "...treat children as adults as equals"[১] এর। স্বাভাবিকভাবেই শিশুর ভালোলাগা-মন্দলাগা, কৈশোরের অনিশ্চয়তা, মনস্তাত্ত্বিক ওঠাপড়া নিয়ে বিস্তৃত হয়েছে এর পরিসর। ছোটদের বিশ্বাসটাকে ধরে রাখতে চাইলে যেটা সবচেয়ে জরুরি সেটা হলো, সেই বিষয়ের উপর লেখকের বিশ্বস্ততা। শিশু পাঠকের সেই বিষয়ের সঙ্গে কমিউনিকেট করাটা

চাইই- চাই। তাই দেখি ছোটা ভীমের পাকামি থেকে ঘুমকাতুরে নোবিতার আলসেমি বা শিনচ্যানের দুরন্তপনায় শিশু মন তো বটেই, আমরা প্রাপ্ত বয়স্করাও আকৃষ্ট হই অনেক বেশি। আমরা মারাত্মক ভুল করব যদি ভাবি যে শিশু সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপদেশ বিতরণ। সাহিত্যরসের উপস্থিতি সেখানে থাকতেই হবে। কারণ আনন্দ রসের সঞ্চার হয় এই সাহিত্য রসের হাত ধরেই। সাহিত্যের রস, ভাব বা বিষয় উপভোগে তারতম্য আসতেই পারে বয়স হিসেবে, কিন্তু তার সর্বজনগ্রাহ্য হওয়ার একটা ক্ষমতা থাকা চাই, "যথার্থ শিশু সাহিত্য বলিতে তাহাই বুঝিব, যাহা সর্ব বয়সের নর-নারীর কাছেই একটি রসাস্বাদ আনিয়া দেয়; বয়সের পার্থক্য অনুসারে আস্বাদনের ব্যাপারে কিছু বিভিন্নতা ঘটিতে পারে-কিন্তু সর্বস্তরের মানুষকে আনন্দ দান করিবার মতো শিল্পগুণ তাহাতে থাকিবেই।"[২]

আর এইজন্যই শিশু বা কিশোরকে তার সমস্ত দোষগুণ নিয়ে সাহিত্যে তুলে ধরাটা অত্যন্ত কঠিন। এখানে গোঁজামিলের কোনো অবকাশ নেই। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যে আমরা যেমন উল্লেখ করতে পারি সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল', 'পাগলা দাশু', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টেনিদা' বা সত্যজিৎ রায়ের 'ফেলুদা'র; অসমিয়া সাহিত্যে তেমনি তুমুল উপস্থিতি ড. ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার।

উদ্দেশ্য

শিশু সাহিত্য পড়ার একটা সুস্থ, স্বাভাবিক সংস্কৃতি আমরা হারিয়েছি বহুদিন। পাঠ্যসূচিতে যা আছে, পরীক্ষার খাতায় তা কতোটা উগড়ে দেওয়া যায় চারপাশে তারই প্রতিযোগিতা। সাহিত্যের সঙ্গে সখ্য, গল্পের প্রতি আগ্রহ শিশুমনে জন্ম নেয় বাড়ির বড়োদের কাছ থেকে গল্প শুনেই। খাটের নিচে শুয়ে বই পড়া বা পড়ার বইয়ের মাঝখানে গল্পের বই রেখে গোগ্রাসে শেষ করার কথা ভাবতেই পারেনা 'ব্লু হোয়েল' আর 'রিল'-এ ডুবে থাকা আজকের প্রজন্ম। কল্পনা প্রবণ নিষ্পাপ মনগুলি মোবাইল,ল্যাপটপ, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইন্সট্রাগ্রামের গণ্ডিতে জড়িয়ে গেছে আপাদশির। সত্যি বলতে আজ আর কোনো টমটম কোথাও নেই। আসলে শিশুর শারীরিক এবং শৈক্ষিক বিকাশ নিয়ে আমরা যতটা চিন্তিত, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ততটা মোটেও নয়। আমাদের এটা বোঝা জরুরি যে আজকের শৈশব যদি সঠিকভাবে লালিত না হয় তাহলে আগামী সমাজ নড়বড়ে হতে বাধ্য। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ড. ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার পরিচয় নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, চলচ্চিত্র নির্দেশক বা চিত্রনাট্যকার হিসেবেই সীমাবদ্ধ নয়। শিশু সাহিত্যিক হিসেবেও অসমিয়া সাহিত্যে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। নিষ্পাপ শৈশব এবং অনিশ্চিত কৈশোরের ছবি আঁকাতেও তিনি ছিলেন দ্বিতীয় রহিত। 'মরমর দেউতা' উপন্যাসে কৈশোরের যে টানাপোড়েনকে তিনি তুলে ধরেছেন, তার মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা করাই আলোচ্য গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য।

পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণা পত্রে মূলত বর্ণনাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিশ্লেষণ

১৮৮৯ সালে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'জোনাকি' পত্রিকার হাত ধরে স্থাপিত হয় অসমিয়া শিশু সাহিত্যের প্রথম ভিত। তাঁর 'জুনুকা','বুঢ়ী আইর সাধু', ককা দেউতা নাতি লরা' অসমিয়া শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এরপর একে একে আসেন জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা ('কম্পুর সপোন', 'অকণমান লরা', 'অকনির সপোন'), রঘুনাথ চৌধুরী ('আমার গাঁও', 'ঈশ্বর'), লক্ষ্যধর চৌধুরী ('মোর লক্ষ্য')। ১৯৪৬ সালে প্রথম অসমিয়া সাময়িক পত্র 'অরুনোদয়' আত্মপ্রকাশ করে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নীতি গল্প ছাড়াও বাইবেলের শিশু উপযোগী কিছু গল্প এখানে নিয়মিত প্রকাশিত হতো ('বাইবেলর সাধু', আফ্রিকার কোঁয়র', 'মাউরী ছোয়ালী','ঈগলর বাহ')। প্রায় এই সময়েই লেখালেখির জগতে আসেন আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন। তাঁর 'অসমিয়া লরার মিত্র', বলদেব মহন্তের 'উজু পাঠ,' দুর্গাপ্রসাদ মজিন্দার বরুয়ার, 'ফুল', 'লরা'এই পর্বের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। স্বাধীনোত্তর পর্বে অসমিয়া শিশু সাহিত্যিক হিসেবে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'নীলা চরাই,' 'জাতকর সাধু', 'কথা কীর্তন'-এর লেখক অতুলচন্দ্র হাজারিকার। এছাড়াও বেণুধর শর্মা, বাণীকান্ত কাকতি, প্রসন্নকুমার ডেকা, নবকান্ত বরুয়া, মুক্তিনাথ বরদলৈ, নির্মল প্রভা বরদলৈ, অনন্তদেব শর্মা, যতীন গোস্বামী, সৌরভ কুমার চলিহার নাম এই পর্যায়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসমের শিশু উপন্যাসের ভিত সুদৃঢ় করে নবকান্ত বরুয়ার 'শিয়ালি পালেগৈ রতনপুর', 'ভ-ত ঊ-কারে ভূ', যোগেন শর্মার 'সুরুজ ওঠা দেশর পিনে', জোন জাক জাক তরা', হোমেন বরগোহাঞির 'সাউদর পুতেকে নাও মেলি যায়'। 'মরমর দেউতা'উপন্যাস নিয়ে এরপরেই আত্মপ্রকাশ করেন ড. ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়া।

বেনজির কথনশৈলী, স্মার্ট শব্দচয়ন, অভিনব উপস্থাপনা, নিটোল রসবোধ নিয়ে ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়া শুরু থেকেই ছিলেন অগতানুগতিক। বিষয়বস্তুর নতুনত্ব এবং অভিনব আঙ্গিক নিয়ে সমসাময়িক লেখকদের থেকে তিনি এগিয়ে গেছেন অনেকখানি। সংক্ষিপ্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক ভবেন্দ্রনাথের বড়ো সম্পদ। এবং যেটা সবচেয়ে অনবদ্য, সেটা হলো অতি নাটকীয়তার অভাব। Sensational বা melodramatic ব্যাপারটাই অপছন্দ ছিল তাঁর। ১৯৪৭ সালে 'উদয়' পত্রিকায় "পথ নিরুপম" গল্প দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরুয়াৎ। তবে রামধনু যুগের স্বনামধন্য এই গল্পকার উপন্যাস এবং নাটক রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অসমিয়া সাপ্তাহিক পত্রিকা 'প্রান্তিক' তথা কিশোর পত্রিকা 'সঁফুরা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ড. শইকিয়ার 'অগ্নিস্নান', 'কোলাহল', 'সন্ধ্যারাগ', 'অনির্বাণ'-এর হাত ধরে আমূল পাল্টে যায় অসমিয়া সিনেমা। চলচ্চিত্র পরিচালক ছিলেন বলেই একটা সহজাত পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল তাঁর। ক্যামেরার পিছনে থেকে গোটা ফিল্মকে যেভাবে আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা ছিল, ঠিক তেমনি লেখক হিসেবেও দৃষ্টি ছিল ছোট বড়ো প্রত্যেকটি জিনিসের উপর। শিশু মনস্তত্ত্বটা বরাবরই ভালো বুঝতেন ড. শইকিয়া। তাঁর প্রথম শিশু বেতার নাটক 'শান্তশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট মহা দুষ্ট' নাটকের, "কিয় নকম? মোর হলেও কম। আরু ডাঙর মানুহর কথা যদি কবই নালাগে, তেনেহলে তেওঁলোকে আমার আগত সেইবোর কাম করে কিয়? ভাবে চাগৈ, --এইবোর পোয়ালি পোয়ালি লরা, কি ডাল বুজে! আমি কিন্তু সব বুঁজো বুইছ!"[৩] -উক্তিতে বাপুর যে মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনকে তিনি তুলে ধরেছিলেন, 'মরমর দেউতা' (১৯৮৯ থেকে ১৯৯০, ধারাবাহিকভাবে 'সঁফুরা' পত্রিকায় প্রকাশিত) উপন্যাসে তাই শীর্ষ বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছে,– "বুঢ়া যাওক, তার পাছত মই তোক কি করোঁ চাই ল। মোতকৈও তোর চুলি চুটি হৈ যাব চাই থাকিবি।"[৪]

ছোট্ট প্রাণের অপরাজেয়তায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আর সুকুমার রায়ের মতই। শিশু সাহিত্যিক হিসেবে তিনি কখনো ভুলেননি যে তিনি তত্ত্ববিদ নন; মতাদর্শ প্রচার করতেও আসেননি। তাই 'ছোট্ট সোনা বন্ধু'রা মার্কা ন্যাকামি দিয়ে শিশু কিশোরদের মন ভোলানোর তাগিদে তাঁর কলম ধরা নয়। পূর্বসূরীদের ছক বাঁধা পথে ভবেন্দ্রনাথ শুরু থেকেই হাঁটতে অস্বীকার করেছেন,

"অসমর মানুহর মতে হেনো শিশু সাহিত্যিক হোয়ার দরে উজু কাম নাই। দুটামান সাধুকথা লিখিয়েই 'লেবেলটো' কপালত মারি লব পারি। চরকারর ঘরলৈ সাহিত্যিক পেনশনর বাবে অহা-যোয়া করিব পারি। আচলতে ই এক বর জটিল কাম। শিশুর মনর খবর বুটলিব নোয়ারিলে আগবাঢ়ি নোহাই ভাল। কেবল সাধুকথাই আজির শিশুর মন ভরাব নোয়ারে। আজির শিশুয়ে আরু বহু কিবা কিবি বিচারে। আজির শিশু সাহিত্যিক অতীতমুখী হলে নহব। ভবিষ্যৎমুখী হব লাগিব। আজির পরা ৪০-৫০ বছরর আগর মানসিকতারে আজির চামর সমস্যার বুজ লবলৈ যোয়াটো এক মারাত্মক ভুল হব।"[৫]

১৯৮১ সালে সুদেব রায়চৌধুরীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ঠিক একই কথা জানিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়,– "লে-আউট, ছাপা, ছবি, যেমন সুন্দর হওয়া দরকার তেমনি এর লেখাগুলিও হবে শিশু কিশোর মনের উপযোগী.... ছোটদের লেখার একটি প্রধান ও প্রচলিত সংজ্ঞা হল, এটি সব বয়সী পাঠক পাঠিকাকে সমানভাবে আকর্ষণ করবে।"[৬]

'শাখা প্রশাখা' সিনেমায় আনন্দমোহনকে যখন তার নাতি প্রশ্ন করেছিল, "আমি এক নম্বর দু'নম্বর জানি, দাদু তুমি কত নম্বর? তিন নম্বর? চার নম্বর?"[৭] অস্থির আনন্দমোহনের তখন চোখ বোজা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সেই সঙ্গে থমকে গিয়েছিল আমাদের সততার প্রশ্নও। সত্যজিতের এই দেখা এবং দেখানোর দৃষ্টিকোণে 'শাখাপ্রশাখা' মুহূর্তেই হয়ে উঠে 'The best human document'। ভবেন্দ্রনাথের 'অগ্নিস্নান' বা 'কোলাহল' সম্পর্কেও কিন্তু আমরা একই কথা বলতে পারি। সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও যে ডিটেলিং এর কাজ করে তামাম বিশ্বকে সেটা শিখিয়েছিলেন সত্যজিৎ। তাঁর সাহিত্যরীতি বরাবরই চিত্রধর্মী। চরিত্র ও ঘটনার ভিসুয়াল ট্রিটমেন্টে তিনি ভীষণ সাবলীল। তাঁর গল্পগুলি আমরা যে শুধু পড়ি তা নয়, গল্পের দৃশ্যগুলিকে দেখি অনেকটা সিনেমা দেখার মতই। উদাহরণ হিসেবে 'দেবী'র কথাই ধরা যাক। সাধারণ এক গৃহবধূ থেকে কালীর অবতার, দয়াময়ীর এই রূপান্তরের জন্য দুটি দৃশ্য ব্যবহার করেননি শ্রী রায়। একটিমাত্র স্বপ্নই যথেষ্ট ছিল। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সিনেমায় ভারতবর্ষের ইতিহাসকে একটিমাত্র বিকেলের পথ চলতি কথাবার্তায় সত্যজিৎ যেমন তুলে আনেন, তেমনি গল্পেও কোথায় থেমে যেতে হয় খুব ভালো করে জানতেন তিনি। 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'-এ অরুণবাবু যখন জানতে চাইলেন ফেলুদা শিকার করে কিনা, সে উত্তর দিচ্ছে "শুধু মানুষ।"[৮] মাত্র দুটি শব্দ. অথচ কী সুদূরপ্রসারী তার বিস্তার! ডিটেইলিং-এর এই অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল ভবেন্দ্রনাথেরও। একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়,–

"ডিটেলছর সূক্ষ্মতম কারুকার্যর বাবে ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার গল্প পঢ়ি পোয়া যায় একেটা সোয়াদ, একেটা কারণতে।"[৯]

চলচ্চিত্র নির্দেশক ছিলেন বলেই ভবেন্দ্রনাথকে যেমন বহু লোকের সঙ্গে মিশতে হতো, তেমনি ছবির শুটিংও

হতো নানান জায়গায়। তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসকে মনে রাখার একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল তাঁর। আর তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই আটপৌরে লোকগুলি-বিপুল, রানী, রিণী, বাবা-মা ,সদানন্দ দত্ত, মৃণালিনী, ময়িদুল তাঁর সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। একইসঙ্গে নিজস্ব রূপ রস গন্ধ স্পর্শ নিয়ে ধরা দিয়েছে অসমিয়া সংস্কৃতি, অসমিয়াদের যাপনচিত্র। ধর্মীয় রীতি-নীতি, সংস্কার থেকে শুরু করে খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ কিছুই এড়িয়ে যাননি তিনি। তাঁর পরিচ্ছন্ন মনের ছাপ 'অগ্নিস্নান', 'কোলাহল' ইত্যাদি সিনেমায় যেমন রয়েছে তেমনি উপলব্ধ হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। শৈশব, শিশুদের মনোজগত নিয়ে অবসেসিভ একটা উদ্বেগ বরাবর ছিল ভবেন্দ্রনাথের। কৈশোর স্নবারি মুক্ত থাকুক এটা আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন বলেই বিপুলের উচ্ছৃঙ্খল আচরণকে immune force বলে এড়িয়ে যেতে তিনি চাননি। Juvenile deliquency কে স্পর্শকাতর বিষয় বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। আর তাই প্রয়াস করেছেন সমস্যার গভীরে যাওয়ার। বিপুলের একাকীত্বের যে যন্ত্রণা, তার অংশীদার হওয়ার। তবে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, তাঁর সৃষ্টিকর্মের কোথাও কোনো উপদেশ নেই। শৈশব-কৈশোরের বিন্যাসে তার নিশ্চিতি আমাদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ।

ভবেন্দ্রনাথ জানতেন, শিশুমন মারাত্মক কৌতূহলী। ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতা থাকে না বলেই খেই হারাতেও এই বয়সে মুহূর্ত লাগে না। 'পথের পাঁচালী'র অপুকে আমরা দেখেছিলাম যে পৃথিবীর সবটুকু জানতে চায়, বুঝতে চায়। 'শাখা প্রশাখা' সিনেমায় তেমনি টয়গান হাতে দরজার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে বড়োদের চলতি আলোচনা শোনা এবং মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা আসলে শিশু মনের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ইঙ্গিত দেয়। ছোটদের কল্পনাপ্রবণ এই মনটাকে বোঝার ক্ষমতা বা মানসিকতা বড়দের প্রায়ই থাকে না। আমরা আমাদের প্রাপ্ত বয়স্কের পৃথিবীতে ওদের কিছুতেই ঢুকতে দেই না। আবার ওদের অনুভূতি, কল্পনা, রাগ, স্বপ্ন বা আবেগকেও ভাগ করে নিতে আমাদের কষ্ট হয়। তাই স্বাভাবিকভাবে কচি মন গুলি হয়ে পড়ে বড্ড একা। এই একাকীত্বের হাত থেকে রক্ষা পেতে কেউ রুকুর ('জয় বাবা ফেলুনাথ') মতো মারাত্মক পথ বেছে নেয়। সুপারসেন্সিটিভ সদানন্দের মতো ('সদানন্দের খুদে জগত') কেউ বা আবার নিজের বিধ্বস্ত মনকে আনন্দ অসুখে সমর্পণ করে। আর্য শেখরের ('আর্যশেখরের জন্ম মৃত্যু') মতো কেউ আবার তৈরি করে নেয় নিজস্ব জগত। কারো মধ্যে অজান্তেই জন্ম নেয় এক ধরনের ক্রিমিনাল মাইন্ডসেট ('মরমর দেউতা')।

বিপুলকে বুঝতে হলে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে তার পারিবারিক পটভূমি। কর্মসূত্রে বিপুলের বাবা থাকেন প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরের পাহাড়ি এক অঞ্চলে। বাড়ির বড়ো ছেলে বিপুল। দিদি রানী, বোন রিণী এবং ছোট ভাই মুকুল সবাই খুব অমায়িক। বিপুল একেবারে অন্যরকম। একগুঁয়ে,অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল। বাবার অনুপস্থিতিতে এমনিতেই সে নিরাপত্তা জনিত অভাবের শিকার। তার ওপর চলছিল বয়ঃসন্ধির শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন। বিপুলের জীবনের এই জটিলতম সময়টিকে অনুভব করার মানসিকতা তার মায়ের ছিল না। সময়ও তিনি পেতেন না। ভবেন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে ধরা পরেছে সবটুকুই,–

"বিপুলর মাক এইবার জিকাটোর শিরবোর চুঁচিবলৈ আরম্ভ করিছে, এনেতে চৌকার ফালর পরা চোঁ-চোঁ শব্দ এটা আহিল। গাখীরখিনি উতলি উফন্দি উঠিছে, অকনমান গাখীর চছপেনটোর কাষেদি বাগরি আহিলেই। জিকা- কটারি এরি বিপুলর মাক দৌরি গল চৌকার ওচরলৈ। খটপকৈ শলিতা কমোয়া হেন্ডেলডাল তললৈ

হেঁচি দি তেওঁ ফু- ফুকৈ নুমুয়াই দিলে... তার পাছত আকৌ জিকার ওচরলৈ আহিল।"[১০]

-এমন অবস্থায় বিপুলের জীবনটা যতটা স্বাভাবিক হবার ততটাই স্বাভাবিক। সে বুঝতে পেরেছে এতখানি একাকীত্ব, এতদূর অনিশ্চিতি নিয়েই তাকে চলতে হবে আজীবন। বিপুলের অব্যক্ত অভাববোধ, অসহায়তাই উপন্যাসটির নির্যাস। কী যে তার কষ্ট, কোথায় যে তার ব্যথা সে কাউকে বোঝাতেই পারেনি। নিঃসঙ্গ বিপুল সকাল থেকে রাত অবধি টোটো করে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে। খেতে ডাকলে আসে না। ঘুম থেকে উঠতে বললে মেজাজ দেখায়, "যেতিয়া মন যায় উঠিম নহয়।"[১১] অনিয়মিত হয়ে আসে স্কুলে যাওয়া, "মই স্কুল নাযাওঁ বুলি কৈছো নহয়।"[১২] ছোট ভাইবোন, মা-বাবা সকলেই তার ব্যবহারে তটস্থ সারাক্ষণ, "মোর কিতাব বহী তই চুবি কিয়?--বুলি টেঁটুফালি চিঞৰি বিপুলে গিলাছটো রাণীর গালৈ জোরেরে মারি পঠিয়ালে।"[১৩] দিন দিন তার ব্যবহার লাগামহীন ঘোড়ার মতো হতে শুরু করে। অনুশাসন সে মানতে নারাজ। কাউকে সম্মান দিতে চায় না। দুলাল, কার্তিক আর ময়িদুলের সাহচর্যে সে কিছুটা আরাম পায়। সিগারেটের ধোঁয়ায় জীবনের আস্বাদ খোঁজে। আলমারি থেকে টাকা সরায়। বাবার কিনে দেওয়া বেল্ট ১০ টাকায় ময়িদুলকে বেচে দেয়। মেটিনি শো তে সিনেমা দেখে। 'মনছুন' নামের টি স্টলে বসে মাটন চপ আর চা খায়। কৈশোরের এই নড়বড়ে সময়টাকে অবিকল আঁকছেন ভবেন্দ্রনাথ–

"বহীবোরত মলাটো নাই, লেবেলো নাই। এইখন বহীত এয়া অঙ্ক করার চিন আছে, মানে অঙ্কর নামত কিবা কিবি লিখি কাটি থোয়া আছে। কিন্তু তার পিছত পাতখিলাত দেখোন কিবা গান লিখা আছে! মেহবুবা! মেহবুবা..।"[১৪]

-বয়ঃসন্ধির ট্রানজিট পিরিয়ডের এই হুবহু ছবি বিপুলের সঙ্গে পাঠকের কমিউনিকেশন বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকখানি।

বিশ্বের কাছে নিজেকে প্রেজেন্টেবল করে উপস্থিত করাটা বয়ঃসন্ধির একটা অবসেশন। সত্যজিতের রুকু সেই জন্যই সুপারম্যান হতে চায়। ঠিক রুকুর মতো না হলেও বিপুলও এর ব্যতিক্রম নয়। উঠতি বয়সী পুত্রের জন্য চিন্তিত ছিলেন তার বাবা। কথা প্রসঙ্গে বন্ধু সদানন্দ দত্তকে সব খুলে বলেন। সদানন্দ দত্ত তাকে 'পলাশনী আই'র বিধি মতো পূজো করতে পরামর্শ দেন। যার জন্য তিন দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি আসেন বিপুলের বাবা। 'পলাশনী আই'র পূজোর অঙ্গ হিসেবে বিপুলকে ছোট করে চুল কাটতে হবে। এদিকে 'টিপটপ' সেলুনে সেট করা কাঁধ অবধি বাহারি চুল কাটতে কিছুতেই রাজি নয় বিপুল। বাবা তাকে বোঝালেন যে নামমাত্র চুল কাটলেই হবে। যেহেতু বিপুলের নামে পুজো দেওয়া হচ্ছে, তাই বিপুলের একটুখানি কাটা চুল নদীতে ভাসিয়ে দিতে হবে। ওটাই পুজোর বিধি। বাবাকে বিশ্বাস করে চুল কাটতে বসে বিপুল। ভরত নাপিতকে বারবার সে বোঝায়, "অকণ অকণ কাটিবি। বেছি চুটি নকরিবি।"[১৫] বিপুলের বাবার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয় ভরতের। তিনি ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন, "তই কাটি যা।"[১৬] কৌশলে বিপুলের প্রায় পনিটেলকে ছোট করে কেটে দেয় ভরত নাপিত। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে বিপুল ভরতের কাঁচি কেড়ে নিয়ে তাকেই আক্রমণ করে। মাকে শাসায়, 'বুঢ়া যাওক তার পাছত মই তোক কি করোঁ চাইল। মোতকৈও তোর চুলি চুটি হৈ যাব চাই থাকিবি।"[১৭] মায়ের সঙ্গে এই দুর্ব্যবহার, বাবাকে 'বুঢ়া' (বুড়ো) বলে সম্বোধন করা দেখে আমরা ধরেই নি যে বিপুলের মতো বখাটে ছেলে

আর দুটো হয় না। কিন্তু সত্যিই কি তাই? বাবার প্রতি থাকা কিশোর পুত্রের বিশ্বাসকে ভেঙে দেননি বিপুলের বাবা!!

অনাহুত এই পরিস্থিতির পর অন্যদিকে মোড় নেয় কাহিনি। একরাতে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বিপুলের পায়ে কেউ সজোরে আঘাত করে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। পুলিশ আসে। প্রথমে দোকানদার গণেশকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কারণ আক্রান্ত হওয়ার রাতে গণেশের সঙ্গে বিপুলের জোর কথা কাটাকাটি হয়েছিল। কিন্তু বিপুলের বন্ধু ময়িদুলকে দোষী বলে ভুয়ো প্রচার করে পুলিশ। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আসল অপরাধী কে খুঁজে বার করা। জেরা করা হয় বিপুলের সহজ সরল বাবাকেও। আর আসল সত্য বেরিয়ে আসে তখন। অবাধ্য, প্রায় বিগড়ে যাওয়া পুত্রকে রাস্তায় ফিরিয়ে আনতে সেই রাতে বিপুলের পায়ে আঘাত করেছিলেন তার বাবাই। ভাবা যায়, একজন বাবা কতটা অসহায় হলে, কতটা কষ্ট পেলে এমনটা করতে পারেন! পুলিশের কাছে তিনি স্বীকার করেন,

"মই দূরত চাকরি করোঁ। সি মোর ডাঙর লরা। তাক যি লাগে মই সকলো দিছোঁ। মই বহুত টকা-পইচা থকা মানুহ নহওঁ।তথাপি তাক মই অভাবত রখা নাই। তার মনটো ভালে থাকিলে সি পঢ়া-শুনা করি ভাল লরা হব --সেই বুলিয়েই বাকী কেইটার মুখরপরা কাঢ়ি হলেও তাক মই যি লাগে দি আছোঁ। কিন্তু কথাবোর এনেকুয়া হলগৈ--মই যেন জ্বলা জুইত শুকান খরিহে জাপি আছো। মই তাক গাখীর খাবলৈ পইচা দিওঁ, সেই পইচারে সি খাব ছিগারেট।....সেইদিনা রেলত গৈ থাকোতে মোর মনটো বর অস্থির হৈছিল।মই অহার পিছত বা সি কি করে!তার চুলি কটার হোরটো যদি সি মাক-বায়েকহঁতর ওপরত তোলে! ভরতক যদি আকৌ মারে! এইবোর ভাবি মই আরু রেলত গৈ থাকিব নোয়ারিলো। এটা স্টেশনত নামি উভতি আহিলো। আন্ধার হোয়ার পাছত মই ঘুরি ঘুরি তাক বিচারি উলিয়ালো।তার পাছত যেতিয়া সি ছিগারেট হুঁপিবলৈ ধরিলে তেতিয়া আরু মই থিরেরে থাকিব নোয়ারিলো। বাঁহর টুকুরাটো ক'ত পালো মোর মনত নাই। মই, মই গার জোরেরে তার ঠেঙত কোব সোবালো।"[১৮]

-মধ্যবয়সী অসহায় বাবার এই হাহাকার হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকা বিপুলের বুকে গিয়ে বাজে বইকি। মা, বাবা, দিদি রাণী, বোন রিণী আর ভাই মুকুলের তার জন্য উৎকণ্ঠা, যেমন করেই হোক তাকে সুস্থ করে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা দেখে অনুতপ্ত হয় সে। ভেতরটা হু হু করে ওঠে তার। সে বুঝতে পারে পরিবারের চেয়ে আপন আর কেউ হতে পারে না। ঠিক তখনই তার মনে পড়ে দিন কয়েক আগে মাকে বাবা বোঝাচ্ছিলেন,

"আচলতে সি বেয়া লরা নহয় বুইছা।তার মনটো বুজি, আমি তাক অলপ মরম করি চলাব লাগিব।অনবরত কেটকেটাই থাকিব নালাগিব।তারো কিছুমান চখ আছে।"[১৯]

-তাকে আনন্দে রাখার, ভালো ছেলে করে তোলার বাবার আপ্রাণ চেষ্টাটা বুঝতে পেরে বিপুল, 'বিছনাতে পোন হৈ বহিল। ডাঙরকৈ উচুপি- উচুপি সি বিছনার পরা নামিবলৈ চেষ্টা করিলে। ডাক্তরে তাক ধরি সহায় করি দিলে। বিপুলে দেউতাকর ভরির ওচরত মাটিতে বাগরি পরি হাও-হাওকে কান্দিবলৈ ধরিলে।....ডাক্তরে কলে, বেমার ভাল হোয়ার লক্ষণ দেখা গৈছে। সেইকারণে কান্দিছে।"[২০]

উপসংহার

সত্যজিতের মতোই কিশোর মনস্তত্ত্বটা খুব ভালো বুঝতেন ভবেন্দ্রনাথ। বিশ্বাস করতেন কিশোর মনের অপরাধ প্রবণতাকে গোড়া থেকে নির্মূল করতে না পারলে আগামী দিনের যৌবন আর বার্ধক্যকে বাঁচানো যাবে না। জীবনের পরিণামী ব্যঞ্জনা কখনোই অন্তিম অন্ধকার হতে পারে না, এ বিষয়ে নিশ্চিত আস্থা ছিল তাঁর। আজকের এই অসুস্থ পৃথিবী নিশ্চয়ই সত্য কিন্তু শেষ সত্য নয়। ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বদলে যেতে পারে অনেক কিছুই,-"এই পথে আলো জ্বেলে এই পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।"[২১] চিরকালের এই বিশ্বাসে আস্থাবান ছিলেন ভবেন্দ্রনাথ সৌরভ কুমার চলিহার মতোই,

"আকৌ পাহারখনলৈ চালো এতিয়া প্রায় অদৃশ্য। আরু বেছি মেঘ জমা হৈছে। বতর সলনি হব ধরিছে। ভৃগু কুমারহঁত গৈ আছে আগুয়াই, বতর আহি আছে আমার অনুকূলে। আমার পাহার টিঙত মেঘ, আমার পথারত বরষুন।"[২২]

-'খরাং' গল্পে ভৃগুর এই এগিয়ে যাওয়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের' হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় বন্যার পর নতুন করে বাঁশবাদী গাঁয়ের পত্তন করার জন্য করালীর গাইতি চালিয়ে বালি কাটা আর মাটি খোঁজা, 'মরমর দেউতা'য় বিপুলের "বেমার ভাল হোয়ার লক্ষণ"[২৩] আসলে একই।

তথ্যসূত্র

১. রায়, সন্দীপ (সম্পাদনা); সত্যজিৎ রায় সাক্ষাৎকার সমগ্র, ফেব্রু ২০২০, পত্রভারতী, কলকাতা, পৃ, ২৬৮।

২. গঙ্গোপাধ্যায়, আশা; শিশু সাহিত্যের স্বরূপ-বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০); ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ; বই.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ, ৩০৪-৩০৫।

৩. শইকীয়া, ড. ভবেন্দ্রনাথ ; ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার শিশু- সাহিত্য সমগ্র; প্রথম প্রকাশ ২০০৬: বনলতা, গুয়াহাটি,পৃ, ৩৫৮।

৪. পূর্বোক্ত;পৃ, ৫২৮।

৫. পূর্বোক্ত; ভূমিকা।

৬. ভট্টাচার্য গোস্বামী, মহুয়া; বাংলা শিশুকিশোর সাহিত্যের ইতিহাস ও বিবর্তন ১৯৫০-২০০০, জানু, ২০১১, পত্রলেখা, কলকাতা, পৃ, ১৭।

৭. চৌধুরী, পার্থপ্রতিম; অতিকায় শাখা প্রশাখা (সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত সত্যজিৎ: জীবন আর শিল্প); প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬; প্রতিভাস, কলকাতা -২ ,পৃ, ৫৭১।

৮. রায়, সত্যজিৎ; 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ', ফেলুদা সমগ্র (১ম খণ্ড); প্রথম প্রকাশ ২০০৫; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা -৯, পৃ, ৬৬৩।

৯. বরা, মহেন্দ্র; এক জেনারেশনর গল্প লেখক; চন্দ্রপ্রসাদ শইকীয়া সম্পাদিত,পৃ, ১৯৫।

১০. শইকিয়া,ড. ভবেন্দ্রনাথ; ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার শিশু-সাহিত্য সমগ্র; প্রথম প্রকাশ ২০০৬: বনলতা, গুয়াহাটি, পৃ, ৫০৯।

১১. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫০৮।

১২. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫১২।

১৩. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫১১।

১৪. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫০৯।

১৫. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫২৪।

১৬. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫২৪।

১৭. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫২৮।

১৮. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫৬৭-৬৮।

১৯. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫১৭।

২০. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫৬৮।

২১. বসু, অম্বুজ; একটি নক্ষত্র আসে; প্রথম প্রকাশ ১৩৭৩: পুস্তক বিপণি, কলকাতা -১, পৃ, ১৭০।

২২. চলিহা, সৌরভ কুমার; নবজন্ম; প্রথম প্রকাশ ২০০৮; লয়ার্স বুক স্টল; গুয়াহাটি -১,পৃ, ২০।

২৩. শইকিয়া, ড.ভবেন্দ্রনাথ; ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার শিশু-সাহিত্য সমগ্র; প্রথম প্রকাশ ২০০৬; বনলতা, গুয়াহাটি,পৃ, ৫৬৮।

অসমিয়া উক্তিগুলির বাংলা ভাবানুবাদ

৩. কেন বলব না? আমার হলেও বলব। আর বড়ো মানুষের কথা যদি বলতেই না হয়, তাহলে তারা আমাদের সামনে সেসব কাজ করে কেন? ভাবে বোধহয়, –এরা ছোট ছোট ছেলে, কী আর বোঝে! আমরা কিন্তু সব বুঝি, বুঝলি!

৪. বুড়ো যাক,তারপর আমি তোর কী করি দেখতে থাক। আমার থেকেও তোর চুল ছোট হয়ে যাবে দেখে নিস।

৫. অসমের মানুষের মতে নাকি শিশু সাহিত্যিক হওয়ার মতো সহজ কাজ আর নেই। দু-একটা নীতিকথা লিখলেই 'লেবেলটা' কপালে লাগিয়ে নেওয়া যায়। সরকারের কাছে সাহিত্যিক পেনশনের জন্য আসা যাওয়া করা যায়। আসলে এটি একটি জটিল ব্যাপার। শিশুর মনের খবর সংগ্রহ করতে না পারলে এগিয়ে না আসাই ভালো। শুধু নীতিকথা আজকের শিশুর মন ভরাতে পারে না। আজকের শিশু সাহিত্যিককে অতীতমুখী হলে চলবে না। ভবিষ্যৎমুখী হতে হবে। আজ থেকে ৪০-৫০ বছর আগের মানসিকতা নিয়ে আজকের প্রজন্মের সমস্যা বুঝতে চাওয়াটা মারাত্মক ভুল হবে।

৯. ডিটেলসের সূক্ষ্মতম কারুকার্যের জন্য ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার গল্প পড়েও পাওয়া যায় একই স্বাদ, একই কারণে।

১০. বিপুলের মা এইবার ঝিঙের শিরাগুলি চাঁচতে আরম্ভ করলেন। এমন সময় চুলোর দিক থেকে সোঁ সোঁ শব্দ একটা

এলো। দুধ উথলে উঠেছে। একটু দুধ সসপেনের গা বেয়ে পড়েও গেলো। ঝিঙে -দা ফেলে বিপুলের মা দৌড়ে গেলেন চুলোর কাছে। ঝট করে শলতা কমানোর হ্যান্ডেলটি নিচে ঠেলে তিনি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলেন। তারপর আবার ঝিঙের কাছে ফিরে এলেন।

১১. যখন ইচ্ছে হবে উঠবো তো!

১২. আমি স্কুলে যাব না বলে বলেছি না!

১৩. আমার বই খাতা তুই ধরবি কেন? বলে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠে বিপুল গ্লাসটা রাণীর গায়ে সজোরে ছুঁড়ে মারলো।

১৪. খাতা গুলিতে মলাট নেই, লেবেলো নেই। এই খাতাটায় অঙ্ক করার চিহ্ন আছে, মানে অঙ্কের নামে কীসব লিখে কেটে রাখা হয়েছে। কিন্তু তার পরের পৃষ্ঠায় দেখি কোনো একটা গান লেখা রয়েছে! মেহবুবা, মেহবুবা!

১৫. একটু একটু কাটবি। বেশি ছোট করবি না।

১৬. তুই কাটতে থাক।

১৭. বুড়ো যাক তারপর আমি তোর কী করি দেখতে থাক। আমার থেকেও তোর চুল ছোট হয়ে যাবে দেখে নিস।

১৮. আমি দূরে চাকরি করি। সে আমার বড়ো ছেলে। তার যা লাগে আমি সব দিয়েছি। আমি প্রচুর টাকা-পয়সা থাকা মানুষ নই। তথাপি তাকে আমি অভাবে রাখিনি। তার মনটা ভালো থাকলে, সে লেখাপড়া করে ভালো ছেলে হবে -সেই জন্যই বাকি কয়টির মুখ থেকে কেড়ে নিয়েও তাকে আমি যা লাগে দিচ্ছি। কিন্তু কথাগুলি এমন হলো আমি যেন জ্বলন্ত আগুনে শুকনো খড়ি দিয়ে যাচ্ছি। আমি তাকে দুধ খাবার টাকা দিলে সেই টাকায় সে খায় সিগারেট। সেদিন রেলে যাওয়ার সময় আমার মন খুব অস্থির ছিল। আমি আসার পর বা সে কী করে! তার চুল কাটার শোধ যদি সে মা দিদিদের ওপর তোলে! ভরতকে যদি আবার মারে! এইসব ভেবে আমি আর রেলে যেতে পারলাম না। একটা স্টেশনে নেমে ফিরে এলাম। অন্ধকার হওয়ার পর আমি ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজে বের করলাম। তারপর যখন সে সিগারেট ধরালো তখন আর আমি স্থির থাকতে পারলাম না। বাঁশের টুকরোটা কোথায় পেলাম আমার মনে নেই। আমি, আমি গায়ের জোরে তার পায়ে কোপ বসালাম।

১৯. আসলে সে খারাপ ছেলে নয় বুঝলে। তার মনটা বুঝে আমাদের তাকে অল্প আদর করে চালাতে হবে। অনবরত খিটখিট না করাই ভালো। তারও কিছু শখ আছে।

২০. খাটে সোজা হয়ে বসলো। জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে খাট থেকে নামার চেষ্টা করল। ডাক্তার তাকে ধরে সাহায্য করলেন। বিপুল বাবার পায়ের কাছে মাটিতে বসে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল। ডাক্তার বললেন, অসুখ ভালো হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সেই জন্য কাঁদছে।

২২. আবার পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এখন প্রায় অদৃশ্য। আরও প্রচুর মেঘ জমা হয়েছে, আবহাওয়া বদলাতে শুরু করেছে। ভৃগু কুমাররা এগিয়ে চলেছে ,আবহাওয়া আসছে আমাদের অনুকূলে। আমাদের পাহাড়ের চূড়োয় মেঘ, আমাদের মাঠে বৃষ্টি।

২৩. অসুখ ভালো হওয়ার লক্ষণ।

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2023v5i2bg5
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -V, Issue-II, December 2023
Pp. 39-52

‘কল্লোল’ পত্রিকার শতবর্ষ : বাংলা সাহিত্যে পালাবদলের ভূমিকা

শংকর কুমার মল্লিক

শংকর কুমার মল্লিক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ
খুলনা, বাংলাদেশ
e-mail : mallickkhluna@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অসংখ্য সাময়িক পত্রের মধ্যে একটি ‘কল্লোল’। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ এর প্রথম সংখ্যা আলোর মুখ দেখে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা পৃথিবীতে যখন ভাঙা-গড়ার পালাবদল চলছে সেরকম সময়েই কল্লোলের আত্মপ্রকাশ। দীনেশরঞ্জন দাস, গোকুলচন্দ্র নাগ, সতীপ্রসাদ সেন-এরকম প্রাণময় কর্মনিষ্ঠ স্বপ্ন-বিভোর আত্ম-প্রত্যয়ী অথচ আর্থিক সংস্থান-শূন্য কয়েকজন তরুণ কল্লোলের ভ্রূণ তৈরি করেন। ‘কল্লোল’ শব্দের আভিধানিক অর্থকে অল্পকিছুদিনের মধ্যে সত্যে পরিণত করেছিলেন আরও বেশ কিছু প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ কবি-লেখক-আড্ডাবাজ মানুষ। সাগরের উর্মিমালার মতো তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে আছড়ে পড়েছিলেন ‘কল্লোল’ এর তটরেখায়। দীনেশরঞ্জন দাশের মেজোদাদার বাড়ি ১০/২ পটুয়াটোলা লেনের দু’খানা ঘরে কল্লোলের দপ্তর স্থাপিত হয়েছিল। মানিকতলায় এক বন্ধুর প্রেস থেকে প্রথম কয়েকমাস পত্রিকাটি ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল। একেবারে অনাড়ম্বর জাঁকজমকশূন্য পরিবেশে দরিদ্র ঘরের সন্তান জন্মের মতো উৎসবহীন ছিল ‘কল্লোল’ এর জন্ম। বাইরে এর ঐশ্বর্য ও জৌলুস না থাকলেও কল্লোলের সদস্যদের প্রাণোচ্ছল আনন্দ ও আবেগের ঐশ্বর্য ছিল আকাশ ছোঁয়া। মাত্র সাত বছরের আয়ুষ্কালে সেকালে ‘কল্লোল’এর সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে একেবারে নবীন লেখক সকলেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। কল্লোলের লেখকরা বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি ও ভাবধারায় কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করতে পেরেছিলেন। মানুষের জীবন ও সমাজের অচর্চিত ও অনালোচিত বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আলো ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে কারণে তাঁদের সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য শত্রু এবং মিত্র উভয়ই সৃষ্টি হয়েছিল। তবে ‘কল্লোল’ পত্রিকা এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা লেখকগোষ্ঠী যারা পরবর্তীকালে ‘কল্লোলীয়’ বা ‘কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক’ বলে পরিচিত হয়েছিলেন, তারা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পেয়েছিলেন। ‘কল্লোল’ পত্রিকা প্রকাশের শতবর্ষে দাঁড়িয়ে অনুভব করি বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব এবং সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব।

মূলশব্দ

কল্লোল পত্রিকা, কল্লোলযুগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তরুণ লেখক গোষ্ঠী, বাংলা সাহিত্যে প্রভাব

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণধর্মী। এখানে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে আকর গ্রন্থ, সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

ভূমিকা

বিশশতকের তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে 'কল্লোল' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন 'কল্লোল'। 'কল্লোলে'র আয়ুষ্কাল অন্য অনেক প্রতিষ্ঠিত ও সমৃদ্ধ পত্রিকার মতো দীর্ঘ না হলেও তার প্রভাব ছিল ব্যাপক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানুষের চেতনায় যে অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল তার প্রভাব বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম-সম্প্রদায়, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর যেমন পড়েছিল তেমনি পড়েছিল সাহিত্য ও শিল্প চেতনায়। এতোদিনের বাংলা সাহিত্য ও শিল্প ভাবনায় রোমান্টিকতা ও কলা কৈবল্যবাদী ভাবনার প্রায় একচ্ছত্র রাজ্যপাট ছিল। সেখানে এসে জায়গা করে নিয়েছিল জীবনের সুগভীর বাস্তবতা। এই সময়ের তরুণ লেখকরা তাঁদের সাহিত্যকর্মে সৌন্দর্যচেতনার পাশাপাশি জীবনের হতাশা, গ্লানি, যৌন-চেতনাকে স্থান দিয়েছিলেন। তা নিয়ে প্রবীণ-নবীনের দ্বন্দ্বও তৈরি হয়েছিল চোখে পড়ার মতো। দুঃসাহসী, প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখকরা জড়ো হয়েছিলেন 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। 'কল্লোল' তাঁদেরকে একই মৃণালে শতদল হয়ে ফুটে উঠতে সাহায্য করেছিল। আবার তাঁদের সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছিল 'কল্লোল' পত্রিকাকে।

বিশ্লেষণ

মাসিক সাহিত্যপত্রিকা 'কল্লোল' প্রকাশিত হয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ। তবে কল্লোলের জন্মের বীজ নিহিত ছিল ফোর আর্টস ক্লাবের সত্তার গভীরে[১]। ফোর আর্টস ক্লাব বা চতুষ্কলা সমিতি বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। এই স্বপ্নায়ু সংগঠনটির স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগ। নারী-পুরুষের সম্মিলনে গড়ে ওঠা এই ক্লাবের চর্চার বিষয় ছিল চারটি। সাহিত্য, সংগীত, চিত্রশিল্প ও কারুশিল্প। ক্লাবের অপর দু'জন কর্ণধার ছিলেন সুনীতি দেবী ও সতীপ্রসাদ সেন। ১৯২১ ও ১৯২২ এই দুই বছর চলার পর ফোর আর্টস ক্লাবের অকাল প্রয়াণ ঘটে। ক্লাব ভেঙে গেলেও তার প্রতিষ্ঠাতা ও অন্য সদস্যরা হতাশ না হয়ে বরং নতুন একটি পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। খুব বেশি প্রস্তুতি ছাড়াই তাঁরা কাজে নেমে পড়েছিলেন। পত্রিকার প্রকাশের জন্য লেখা, ছাপার খরচ কোনোকিছুই সেভাবে না থাকলেও কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল। মনীন্দ্রলাল বসুর লেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আর প্রবাসী পত্রিকার সাথে যুক্ত সুধীর কুমার চৌধুরীর লেখক যোগাড় করে দেওয়ার আশ্বাসের ওপর বিশ্বাস রেখে গোকুলচন্দ্র নাগের আত্মপ্রত্যয়, সতীপ্রসাদ সেনের অসামান্য কর্মনিষ্ঠা এবং দীনেশরঞ্জন দাশের নিপুণ পরিচালন ক্ষমতায় কল্লোলের যাত্রা শুরু হয়েছিল। 'কল্লোল' নাম দিয়েছিলেন স্বয়ং সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ। তিনি লিখেছেন, "নাম ঠিক করিয়া ফেলিলাম-

'কল্লোল'। গোকুলের ব্যাগে ছিল এক টাকা আট আনা, আমার কাছে ছিল দুই টাকা-এই সম্বল লইয়া দোকান হইতে কাগজ কিনিয়া একটি ছোট প্রেসে কল্লোলের প্রথম হ্যান্ডবিল ছাপা হইল। চৈত্র মাসের ৩০ তারিখে চৈত্র সংক্রান্তি, সং দেখিতে পথে বিপুল জনতা হয়। সেই সুযোগে গোকুল ও আমরা কয়েকজন মিলিয়া হ্যান্ডবিল বিলি করিতে বাহির হইয়াছিলাম। ইহার পূর্বেই কল্লোলের কিছু কপি প্রেসে ছাপিতে দেওয়া হয়। বিধাতার সাহায্যে ১৩৩০-এর পহেলা বৈশাখ 'কল্লোল' ছাপিয়া বাহির হইল।"[২] কল্লোলের কার্যালয় স্থাপিত হয়েছিল দীনেশরঞ্জন দাশের মেজদাদার বড়ি ১০/২ পটুয়াটোলা লেনের- দু'খানা ঘরে। 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল একদল প্রতিশ্রুতিশীল লেখক। বয়সে তারা প্রায় সবাই নবীন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং নতুন লেখক। কারো লেখা হয়তো অন্য দু'একটা পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে আবার কারো লেখা হয়তো মনোনীত না হয়ে ফেরত এসেছে। কিন্তু তাদের লেখক হওয়ার মতো মেধা, প্রতিভা, যোগ্যতা, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, পড়ালেখা সবটাই আছে। পূর্বপরিচিত, সদ্যপরিচিত, অর্ধপরিচিত সকলের সম্মিলনে এবং তুমুল আড্ডার মধ্যে কল্লোলের জীবনপ্রবাহ চলে। বাঙালির জন্মাগত ধাত আড্ডা দেওয়া। বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি ও সমৃদ্ধির সাথে আড্ডার গভীর যোগসূত্র রয়েছে। সে আড্ডার জন্মসূত্র মুখ্যত কোনো না কোনো পত্র-পত্রিকা। 'কল্লোল' এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। কল্লোলের অফিস ঘর, তার আসবাবপত্র সবক্ষেত্রে দারিদ্র্য ছিল চোখে পড়ার মতো। আড্ডাধারীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তবে কল্লোলের আড্ডার রসে সবাই বুদ হয়ে থাকতেন। কোনোদিক থেকেই সেখানে আরামের কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না, তবু কল্লোলের আড্ডার আসরের আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। আড্ডাধারী হরিহর চন্দ্র লিখেছেন–

> এক অখ্যাত অবজ্ঞাত পল্লীর মধ্যে সর্বপ্রকারের বাহ্য আড়ম্বর এবং সর্বপ্রকারের আকর্ষণশূন্য সেই গৃহকোণটির পরিচয় দশের দুই পটুয়াটোলা লেন। এই গৃহের একতলায় বসিবার জন্য ছোট একখানি ঘর আছে। ...শিল্পী দীনেশরঞ্জনের হাতে সেই ঘরখানি "নিমেষে নিমেষে নিতুই" রূপ দেখিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, তাঁর আকর্ষণ প্রাণে প্রাণে বোধ করিয়াছি, স্বেচ্ছায় ও পরমানন্দে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই অপ্রশস্ত ঘরে আমাদের জীবনের সর্বোত্তম দিনগুলির অধিকাংশ কি করিয়া কাটিয়া গিয়াছে, তার কোনও হিসাব নিকাশ নাই।[৩]

কল্লোলের আড্ডায় যারা নিয়মিত আসতেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন–

> অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পবিত্র গাঙ্গুলি, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ভূপতি চৌধুরী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, মুরলীধর, অজিত সেন, সতীপ্রসাদ সেন (গোরাবাবু), সুবোধ দাশগুপ্ত, হরিহর চন্দ্র, নির্মল সিংহ, সোমনাথ সাহা, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রবোধকুমার সান্যাল, সুবোধ রায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, বুদ্ধদেব বসু, অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ চক্রবর্তী, অমলেন্দু বসু, বিষ্ণু দে, সুকুমার ভাদুড়ী, বিজয় সেনগুপ্ত, মণীশ ঘটক, সনৎ সেন, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, হেমচন্দ্র বাগচী, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সুরেশ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন দাস, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ।[৪]

কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে তরুণ লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাঁরাই পরবর্তীকালে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক

হিসেবে পরিচিতি পান এবং বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কল্লোল যুগ বা কল্লোল কালপর্বের জন্ম হয়। ভারতবর্ষে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালির আবেগ স্তিমিত হয়ে আসে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার কারণে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দিলেও যুদ্ধ শেষে তা মিথ্যায় পরিণত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশ্ববাসীর মনের গভীরে গাঢ় রেখাপাত করে। মানুষের এতকালের আদর্শ ও বিশ্বাসের মর্মমূলে অভিঘাতের সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষের বিশেষকরে বাংলার যুব-মানসে সঞ্চারিত হয় এক বিপুল নৈরাশ্য। বাঙালির চিন্তা-মনন ও সৃষ্টি রাজ্যে একটা আমূল পরিবর্তন আসে। আর্থ-সামাজিক কারণে জীবন সম্পর্কে পূর্বের ধ্রুব বিশ্বাস ও আদর্শ-নিষ্ঠার অবক্ষয় ঘটে মানুষের মনে। যুদ্ধ পরবর্তী কালের ভাঙনে তরুণ সমাজের তখন অর্থনৈতিক স্থিতি নেই;- সংশয় হতাশা, দৈন্য নীতিহীনতা তারুণ্য শক্তিকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। চারিদিকে শূন্যতার অগ্নি বলয়, হতাশা থেকে আসতে শুরু করেছে নিঃসঙ্গতা ও নৈরাজ্য। কল্লোলের তরুণ লেখক গোষ্ঠী ছিলেন এই নৈরাজ্য-নৈরাশ্য পীড়িত যুব সমাজের প্রতিনিধি। তাই কল্লোল পত্রিকা প্রকাশের প্রেক্ষাপট ছিল যুগের তাড়না। যুগচিন্তার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে কল্লোল তার বিদ্রোহের জয়ধ্বজা উড়িয়ে চলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা বাংলার অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছিল। একদিকে তীব্র খাদ্য ও বস্ত্র সংকট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বাংলার নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। যুব চিত্তের এই যন্ত্রণা 'কল্লোল' এর রচনাগুলিতে ভাষা রূপ লাভ করেছিল।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পেষণে নৈরাশ্য পীড়িত যুব সমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কল্যাণ চেতনা ও পবিত্র ভাবমূর্তি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছিল। ফলে কাব্য ক্ষেত্রের মতোই কল্লোলের তরুণ কথাসাহিত্যিকেরাও নতুন উপাদানের সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। কল্লোলের তরুণ লেখকেরা রোমান্টিক ভাবালুতাকে বিসর্জন দিয়ে নগ্ন বাস্তবের মাটিতে নেমে আসতে চাইলেন। তাদের রচনায় প্রেম ও সৌন্দর্যের ধারণায় রবীন্দ্র-বিরোধিতা প্রকট হয়। কল্লোলের সাহিত্যিকেরা দেহকেন্দ্রিক জৈব প্রেমের কামনা-বাসনার চিত্র, কদর্য জীবনের আদিম সৌন্দর্যকে রূপায়িত করেন। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় বলতে পারি;– "যাকে কল্লোল যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।"[৫]

১৯১৩-'১৪ নাগাদ মনোবিজ্ঞানী সিগমন্ড ফ্রয়েড তাঁর যৌন বিষয়ক তত্ত্বে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের ভিতটিকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফলে দেহাতীত প্রেমের ভাব কল্পনার পরিবর্তে দৈহিক কামনার বাস্তবতা স্বীকৃতি পেয়েছিল কল্লোলের তরুণ সাহিত্যিকদের লেখনীতে। উগ্র বাস্তবতার পথ ধরে যৌনতার অনুপ্রবেশ ঘটে কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্যে। সেই সাথে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উগ্র বাস্তবতা সঞ্চারিত হয় কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে। শ্রমিকবস্তি, ফুটপাতবাসী, গণিকাপল্লী, ও অন্যান্য নিচুতলার মানুষের নগ্ন আদিম স্থূল জীবন চিত্র উঠে আসে কল্লোলের কথাসাহিত্যের উপকরণ হিসেবে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন–

"রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল কল্লোল। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে; কয়লাকুঠিতে, বস্তিতে, ফুটপাতে, প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।"[৬]

সাম্যবাদ ও কমিউনিজম্ এর প্রভাবও 'কল্লোল' পত্রিকার তরুণ লেখক গোষ্ঠীকে নিচুতলার মানুষের জীবন চিত্র অঙ্কনে উদ্দীপ্ত করেছিল। আসল কথা বাস্তবতার চর্চা, রবীন্দ্র বিরোধী মানসিকতা, যৌনতার কুণ্ঠাহীন

প্রকাশ, নিচুতলার মানুষের জীবন চিত্র অঙ্কন, নৈরাশ্য ও যুগ যন্ত্রণার প্রকাশ, সাম্যবাদী চেতনা, যৌবনাবেগ ও বিদ্রোহ চেতনাই 'কল্লোল' পত্রিকাগোষ্ঠীর সাহিত্য আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। 'কল্লোল' পত্রিকা এবং এর নতুন লেখকদের অন্যতম প্রসন্ন প্রশ্রয়দাতা ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। নতুনের প্রতি, প্রবাহমানতার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল প্রবল। তাই এই প্রতিশ্রুতিশীল নতুন লেখকদের সতত উৎসাহিত করতেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন :

> "বলতেন, 'এমন ভাবে লিখে যাবে যেন তোমার সামনে আর কেউ দ্বিতীয় লেখক নেই। কেউ তোমার পথ বন্ধ করে বসে থাকেনি। লেখকের সংসারে তুমি একা, তুমি অভিনব।'
> 'আমার সামনে আর কেউ বসে নেই ?' চমকে উঠতাম।
> 'না।'
> 'রবীন্দ্রনাথ ?'
> 'রবীন্দ্রনাথও না ! তোমার পথের তুমিই একমাত্র পথকার। সে তোমারই একলার পথ। যতই দল বাঁধো প্রত্যেকে তোমরা একা'।"[৭]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে রবীন্দ্রনাথের কমলা বক্তৃতামালা শোনার সময় সেই সময়ের তরুণ ছাত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন এবং বলেছেন তার পরে আর কিছুই লেখার এবং বলার নেই। কিন্তু কল্লোলের আসরে এসে তাঁর সেই ভুল ভেঙে যায়। নতুন স্বপ্নে এবং ভাবে তিনি বিভোর। এটাই ছিল কল্লোলের অন্তর্ভেদী শক্তি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন–

> বক্তৃতা শুনতে-শুনতে এই সব ভাবতুম বসে বসে। ভাবতুম, রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের শেষ, তাঁর পরে আর পথ নেই, সংকেত নেই। তিনিই সব-কিছুর চরম পরিপূর্ণতা। কিন্তু 'কল্লোলে' এসে আস্তে আস্তে সে-ভাব কেটে যেতে লাগল। বিদ্রোহের বহ্নিতে সবাই দেখতে পেলুম যেন নতুন পথ, নতুন পৃথিবী। আরো মানুষ আছে, আরো ভাষা আছে, আছে আরো ইতিহাস। সৃষ্টিতে সমাপ্তির রেখা টানেননি রবীন্দ্রনাথ-তখনকার সাহিত্য শুধু তাঁরই বহুকৃত লেখনের হীন অনুকৃতি হলে চলবে না। পত্তন করতে হবে জীবনের আরেক পরিচ্ছেদ। সেদিনকার 'কল্লোলে'র সেই বিদ্রোহ-বাণী উদ্ধতকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলুম কবিতায় :
>
> এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহংকার,
> যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
> কারেও ডরি না কভু; সুকঠোর হউক সংসার,
> বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর সরণি।
> পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
> সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর,
> আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
> যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর!

গভীর আত্মোপলব্ধি-এ আমার দুর্দান্ত সাহস,
উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছি নব-নর-জন্ম-সম্ভাবনা ;
অক্ষরতুলিকা মোর হস্তে যেন রহে অনলস,
ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি-নবীন প্রেরণা !
শক্তির বিলাস নহে, তপস্যার শক্তি আবিষ্কার,
শুনিয়াছি সীমাশূন্য মহা-কাল-সমুদ্রের ধ্বনি
আপন বক্ষের তলে; আপনারে তাই নমস্কার।
চক্ষে থাক্ আয়ু-উর্মি, হস্তে থাক্ অক্ষয় লেখনী ![৮]

কল্লোলের পাতায় অচিন্ত্যকুমারের এই আত্ম-আবিষ্কারের ঘোষণা শুধু তাঁকেই নয় সমকালীন বহু নতুন লেখককে উজ্জীবিত ও প্রাণিত করেছিল। উল্লেখ্য যে, কল্লোলের রবীন্দ্র-বিরোধিতার সম্পর্কে যে জনশ্রুতি পরবর্তীকালে প্রচারিত হয়েছিল তা এই কবিতাটির জন্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সেখানে যে সমস্ত রাজারাজড়ার কাহিনী দেখতে পাই তারা বাঙালির বাস্তবজীবনে দূরে থাক কল্পনার মধ্যেও ছিল না। যেখানে তিনি বাস্তব মানুষের কথা বলেছেন সেখানেও গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রনাথের মতো জমিদার-নন্দনদেরই প্রাধান্য-সাধারণ মানুষরা আছে শুধু তাদেরই জীবনের প্রয়োজনে। রবীন্দ্রনাথ সেই বাংলা কথাসাহিত্যকে উঁচুতলা থেকে কিছুটা টেনে নামিয়ে এনেছিলেন বাস্তব পটভূমিতে-উচ্চ-মধ্যবিত্ত কিংবা পল্লীবাংলার মাটির মায়েরা সেখানে কম-বেশি স্থান পেলেন। শরৎচন্দ্র এসে দাঁড়ালেন একেবারে সাধারণ মানুষের আঙিনায়, তাদের হৃদয়ের কাছাকাছি। তার পরবর্তীকালের লেখকরা-পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণ আরও সাধারণ মানুষের কাছাকাছি এসেছিলেন। এই পটভূমিকায় কল্লোল পত্রিকার বিদ্রোহী-বিপ্লবী নবীন লেখকরা শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন না-তাঁরা দাঁড়ালেন জনগণের স্বপক্ষে, তাদের জীবনের শরিক হয়ে। জনগণের কাছাকাছি আসাকে সেই সময়ে কেউকেউ তাঁদেরকে বস্তিবিলাস বা শ্রমিকবিলাস বলে নিন্দা জানালেও ইতিহাসের কাছে তা জনচেনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আমাদের সমাজের দরিদ্র্য ও নিপীড়িত মানুষেরা বর্ণগত এবং অর্থগত উভয় দিক দিয়েই অন্ত্যজ শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত। আমাদের সাহিত্যিকদের, কাছে এই অন্ত্যজ মানুষেরা এতকাল সুবিচার পায়নি। তাদের সম্পর্কে লেখকদের বিমুখতা না থাক, অপরিচয়ের অজ্ঞতা ছিলই। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র মনুষ্যত্বের অবমাননা যেখানে দেখেছেন সেখানেই বন্ধনের পীড়ন অনুভব করে সহানুভূতি দেখিয়েছেন, তবে তাঁদের দৃষ্টি মুখ্যত ছিল সামাজিক কুসংস্কার-পীড়িত জনবিন্যাসের দিকে। কল্লোলের লেখকরা এই উপেক্ষিত দিগন্তের দিকে চোখ মেলে দাঁড়ালেন। কুলি-মুটে-মজুরের অস্তিত্বের নানা সংকটের-ভাষাচিত্র আঁকলেন। কল্লোলের পৃষ্ঠায় নানা জাতীয় মানুষের ভিড়-ধনী-নির্ধন-মধ্যবিত্ত, জমিদার-ব্যবসায়ী, কুলি-মজুর-চাষী, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান, ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র। সবকিছু মিলিয়ে দেখা যায় ধর্ম-বর্ণ-অর্থগত প্রান্তজনেরাই নতুন অর্থ বহন করে সাহিত্যের অঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছে। নবীন লেখকরা যেন শোভাযাত্রা করে সেইসব অচ্ছুত মানুষকে সাহিত্যের রাজদরবারে স্থান দিলেন। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকের জনচেতনার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক তাৎপর্য এখানেই।

কল্লোলগোষ্ঠীর জনমুখী দৃষ্টি সে-কালে প্রচুর আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিল। সেটাই মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন তাঁরা। সময়ের পথ কেটে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নতুন ভাবধারা সৃষ্টিই তাঁদের অন্বিষ্ট ছিল। সমকালীন দেশ এবং বিদেশের রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্যের আন্দোলন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এইসব তরুণ লেখকদের মনোজগতে গভীর রেখাপাত করেছিল, কার্যকর উপাদান জুগিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে নতুন মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁদের ক্ষেত্রেও উপস্থিত ছিল, সন্দেহ নেই। তবে তাঁদের সাহিত্যিক মনের রসায়নে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে কতখানি সংরক্ষিত ও সংহত হয়েছিল সেটাই কল্লোল যুগের সাহিত্য-বিচারে প্রধান লক্ষণীয়। দেখা যাবে কল্লোলের নবীন লেখকরা নতুন নতুন প্রবণতার প্রবর্তনায় বাংলা সাহিত্যকে অনেকখানি বদলে দিতে পেরেছিল এবং তার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের পালাবদল ঘটলেও প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল প্রবীণ লেখকরা নবীনদের কাছে সাহিত্যের মালাবদল করতে যথেষ্ট কুণ্ঠিত ছিলেন। তবে এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নরেন্দ্র দেব প্রমুখ ছিলেন ব্যতিক্রম।

কল্লোল পত্রিকা এবং কল্লোলগোষ্ঠীর-আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল যৌবনের পূজা। যদিও তাদের আগেই 'সবুজপত্র' পত্রিকার মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরী সেই সাধনায় যুক্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো চিরযৌবনা কবি সেখানে যৌবনের জয়গান করে কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু কল্লোলগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছিল যৌবনের জয়পতাকা উড়িয়ে। যে বীজমন্ত্র তাঁদের সাহিত্যচর্চার-মূলগত প্রেরণা জুগিয়েছিল তা হচ্ছে যৌবনের সজীবতা। প্রাজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা নয়, স্থিরবুদ্ধির বিবেচনাও নয়, আবেগতাড়িত যৌবন-ধর্মের অবিবেচনাই ছিল তাঁদের পথচলার পাথেয়। কল্লোল পত্রিকা প্রকাশের শুরুতেই আমরা উদ্যোক্তাদের মধ্যে সেই ভাব-বৈশিষ্ট্য দারুণভাবে প্রত্যক্ষ করি। কল্লোলের প্রাণ-পুরুষ গোকুলচন্দ্র নাগকে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন– 'যৌবন-পথিক, নব বসন্তের সুরভিত দক্ষিণ বাতাস'। কল্লোলের পাতায় সেই যৌবনের- দুরন্ত উচ্ছ্বাস খুব সহজেই লক্ষ করা যাবে। কয়েকজন কবির কয়েকটি কবিতার-অংশবিশেষ এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে জাগল তরুণ প্রাণ;
জমাট করা অন্ধকারের বিশাল প্রাচীর টুটে
উৎসারিত আলোর পানে বেরিয়ে এল ছুটে-
চক্ষে তাহার নবীন দীপ্তি কণ্ঠে নূতন গান।[৯]

–"কল্লোল", সুনীতি দেবী

যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে
বসে আছি আমি।
দগ্ধ স্বর্ণরেণু-সম বালুকণারাশি
লুটায় চরণপ্রান্তে অকৃপণ বিপুল বৈভবে![১০]

–"শাপভ্রষ্ট", বুদ্ধদেব বসু

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে–
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে ![১১]

– "সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে", কাজী নজরুল ইসলাম

আজ দরজায়
তাই ত' কবি ডাক্ দিয়ে যায়–
ফাগুন ফুরায়–
আগুন জুড়ায় !
মধু-মাসের মহোৎসব দস্যু হ'য়ে লুটবি কে আয়
ছিনিয়ে নেবার সাহস যে চাই–
বিনিয়ে কাঁদিস্ কার ভরসায় ?[১২]

–"কবি-নাস্তিক", প্রেমেন্দ্র মিত্র

তব দগ্ধ আতপ্ত চুম্বনে
যৌবন উঠুক দুলি' উচ্ছ্বসিয়া ধরিত্রীর স্তনে।
সঙ্কোচ-লজ্জিত ম্লান যত ব্যথা জমেছিল শীতে,
বাষ্প হয়ে যাক উড়ে তব সৌম্য নয়ন-ইঙ্গিতে !
আন আন অগ্নির ঝটিকা,
মরণের যজ্ঞে জ্বাল যৌবনের দীপ্ত হোমশিখা
হে পবিত্র![১৩]

–"সূর্য", অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

"হে নূতন জাগরণ, হে ভীষণ, হে চির-অধীর,
হে রুদ্রের অগ্রদূত, বিদ্রোহের ধ্বজবাহী বীর...
ঝঞ্ঝার প্রবাহে নাচে কেশগুচ্ছ, গৈরিক উত্তরী,
সেথা তুমি জীর্ণে নাশি নবীনের ফুটাও মঞ্জরী,
হে সুন্দর, হে ভীষণ, হে তরুণ, হে চারু কুমার,
হে আগত, অনাগত, তরুণের লহ নমস্কার।।"[১৪]

–তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্লোলের যাত্রা শুরু হয়েছিল 'গল্প-মাসিক' হিসেবে। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ঘোষণা ছিল-'কল্লোল-মাসিক গল্প-সাহিত্য। দ্বিতীয় বর্ষের (১৩৩১) ভাদ্রসংখ্যা পর্যন্ত প্রচ্ছদ পটে লেখা থাকতো 'বাংলার মাসিক গল্প-সাহিত্য'। ১৩৩১ এর আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত বিজ্ঞাপনেও কল্লোল সম্বন্ধে বলা হয়– 'বাংলার মাসিক গল্প-সাহিত্য পত্রিকা'। তবে শুরু থেকেই কল্লোলের পৃষ্ঠায় দু'একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে কবিতার সংখ্যা বেড়েছে। বেশ করেকটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছে প্রবন্ধ। এমনকি কল্লোলের পাতায় প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবিও ছাপা হয়েছে। তবে শতবর্ষ আগে

কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প এবং উপন্যাস নিয়েই বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। মৌলিক এবং অনূদিত দু'রকম গল্প সেখানে প্রকাশিত হতো। মৌলিক গল্পকারদের মধ্যে সুনীতি দেবী, কেতকী দেবী, শৈলজানন্দ, প্রবোধ সান্যাল, সোমনাথ সাহা, মিনতি দেবী, বিজয় সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শান্তা দেবী, মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), নির্মল কুমার রায়, জলধর সেন, জগদীশ গুপ্ত, তারানাথ রায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, প্রীতি সেন, উমা মিত্র, রমেশচন্দ্র দাশ, প্রমথ চৌধুরী, নিরুপমা দেবী, অমলেন্দু বসু, পঞ্চানন ঘোষাল, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্র কুমার রায়, তারানাথ রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, প্রণব রায়, দেবকী বসু, বিষ্ণু দে, মায়া দেবী, কল্যাণী পাল প্রমুখ।[১৫]

> কল্লোল' পত্রিকায় মোট এগারোটি মৌলিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে আমরা যাঁদের পেয়েছি- গোকুলচন্দ্র নাগ ('পথিক'), হরিপদ বসু ('ঘাটের পথে'), নরেন্দ্র দেব ('যাদুঘর'), সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ('স্মৃতির আলো'), অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত ('বেদে'), প্রেমেন্দ্র মিত্র ('মিছিল'), দীনেশরঞ্জন দাশ ('দীপক'), সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় ('রূপছায়া'), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ('পান্থবীণা' ও 'ডাক-পিয়ন')।

কবিদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জসীম উদ্‌দীন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, দীনেশরঞ্জন দাশ, কালিদাস নাগ, অমিয় চক্রবর্তী, হুমায়ুন কবির, হেমচন্দ্র বাগচী, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে, বন্দে আলী মিয়া, মনোজ বসু প্রমুখ। কল্লোলের লেখক তালিকায় বেশকিছু নারী লেখককে আমরা পাই। তাঁদের মধ্যে সীতা দেবী, শান্তা দেবী, সুনীতি দেবী, নীলিমা বসু, সরোজ কুমারী দেবী, লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়, নৃসিংহদাসী দেবী উল্লেখযোগ্য।[১৬] কল্লোলের একটি লক্ষ্য ছিল পাঠক-পাঠিকাকেও লেখক হিসেবে গড়ে তোলা এবং নতুন লেখককে উৎসাহ জোগানো। কোনো নতুন লেখকের লেখা মনোনীত না হলেও সম্পাদকের টেবিল থেকে প্রেরণামূলক চিঠি যেত লেখকের কছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বন্ধু সুবোধ দাশগুপ্তের চমৎকার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত :

> জাহাজে বসে এতদিন যত লিখেছে সুবোধ, তারই থেকে একটা গল্প বেছে নিয়ে কী খেয়ালে সে "কল্লোলে" পাঠিয়ে দিয়েছিল। আরো অনেক কাগজে সে পাঠিয়েছিল সেই সঙ্গে, হয় খবর এসেছে মনো- নয়নের, নয় ফেরৎ এসেছে লেখা-সেটা এমন কোনো আশ্চর্যজনক কথা নয়। কিন্তু "কল্লোলে" কী হল ? "কল্লোল" তার গল্প অমনোনীত করলে, সম্পাদকীয় লেপাফায় লেখা ফেরৎ গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে গেল একটি পোস্টকার্ড। "যদি দয়া করে আমাদের আফিসে আসেন একদিন আলাপ করতে!" তার মানে, লেখা অপছন্দ হয়েছে বটে, কিন্তু লেখক, তুমি অযোগ্য নও, তুমি অপরি ত্যাজ্য। তুমি এসো। আমাদের বন্ধু হও।
>
> ঐ পোস্টকার্ডটিই গোকুল।
> ঐ পোস্টকার্ডটিই সমস্ত "কল্লোলে"র সুর। "কল্লোলের" স্পর্শ।
> তার নীড়-নির্মাণের মূলমন্ত্র ।

> খবর শুনে মন নরম হয়ে গেল। আমার লেখা বাতিল হলেও আমার মূল্য নিঃশেষ হয়ে গেল না এত বড় সাহসের কথা কোনো সম্পাদকই এর আগে বলে পাঠায়নি। যা লিখেছি তার চেয়ে যা লিখব তার সম্ভাব্যতারই যে দাম বেশি এই আশ্বাসের ইসারা সেদিন প্রথম পেলাম সেই গোকুলের চিঠিতে।[১৭]

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা আরও চমকপ্রদ এবং তীব্র। তাঁর সেই প্রথম যৌবনের লেখা যখন কোথাও ছাপা হচ্ছে না বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অফিস থেকে অমনোনীত হয়ে ফিরে আসছে কখনো কখনো তার সাথে জুটছে কিছু কিছু অপমানসূচক বাণী ও বক্তব্য। মনের কষ্টে নিজের লেখা কবিতা, গল্প, নাটিকা সব পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। পুরনো কল্লোলের পাতা থেকে ঠিকানা পেয়ে পাঠালেন 'রসকলি' গল্প। তার পরে কী ঘটেছিল তা লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত–

> মনে পড়ে গেল 'রসকলি'র কথা-সেটা তো পোড়ানো হয়নি এখনো! তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে গল্পের শেষ পৃষ্ঠাটা সে নতুন করে লিখলে। ও পৃষ্ঠার পিঠে "প্রবাসী"তে পাঠাবার সময়কার পোস্টমার্ক পড়েছে, তাই ওটাকে বদলানো দরকার-পাছে এক জায়গার ফেরৎ লেখা অন্য জায়গায় না অরুচিকর হয়। জয় দুর্গা বলে পাঠিয়ে দিল লেখাটা। যা থাকে অদৃষ্টে ।
>
> অলৌকিক কাণ্ড-চারদিনেই চিঠি পেল তারাশঙ্কর। শাদা পোস্টকার্ডে লেখা। সে-কালে শাদা পোস্টকার্ডের আভিজাত্য ছিল কিন্তু চিঠির ভাষায় সমবস্থ আত্মীয়তার সুর। কোণের দিকে গোল মনোগ্রামে "কল্লোল" আঁকা, ইতিতে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। মোটমাট, খবর কি? খবর আশার অধিক শুভ-গল্পটি মনোনীত হয়েছে। আরো সুখদায়ক, আসছে ফাল্গুনেই ছাপা হবে। শুধু তাই নয়, চিঠির মাঝে নির্ভুল সেই অন্তরঙ্গতার স্পর্শ যা স্পর্শমণির মত কাজ করে : 'এতদিন আপনি চুপ করিয়া ছিলেন কেন ?
>
> পবিত্রর চিঠির ঐ লাইনটিই তারাশঙ্করের জীবনে সঞ্জীবনীর কাজ করলে। যে আগুনে সমস্ত সংকল্প ভস্ম হবে বলে ঠিক করেছিল সেই আগুনই জ্বাললে এবার আশ্বাসিকা শিখা। সত্য পথ দেখতে পেল তারাশঙ্কর। সে পথ সৃষ্টির পথ, ঐশ্বর্যশালিতার পথ।[১৮]

কল্লোলের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ উঠেছিল সেকালে। সে অভিযোগ সাহিত্যে অশ্লীলতা সৃষ্টি ও যৌনতার প্রকাশ নিয়ে। যদিও সে অভিযোগ সবকালে নতুন লেখকদের বিরুদ্ধে কম-বেশি থেকেছে। বিধবার প্রেম থেকে অসামাজিক প্রেমের দায় বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে অনেক লেখককে বয়ে বেড়াতে হয়েছে। যে বিধবার প্রেমের দৃষ্টান্ত রেখে বঙ্কিম তথাকথিত অপরাধ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'তে তার আরও বাস্তবিক ও মনস্তত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজেছিলেন। এবং সেই বলিষ্ঠ মানসিকতার জন্যই শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে 'চোখের বালি' (১৯০৩) হয়ে উঠেছিল আধুনিক উপন্যাসের পথিকৃৎ। তাঁর 'বড়দিদি" ও 'পল্লীসমাজ' সেই একই দৃষ্টিসূত্র অবলম্বন করে লিখিত। অন্যপূর্বা নারীর সধবা অবস্থায় পূর্বপ্রেমের জের টানার উদাহরণ বঙ্কিম সাহিত্য থেকে উৎসারিত হয়ে শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' ও 'স্বামী'তে আরও দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এই অসামাজিক প্রেমকে বাংলা উপন্যাসে বিশ শতকের প্রারম্ভে নূতন করে রূপ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন বিবাহিত অবস্থায় অন্য পুরুষের প্রতি প্রেম সঞ্চারের কাহিনি রচনা করে-

লিখলেন শতাব্দীর শুরুতে "নষ্টনীড়" (১৩০৮) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬)। আর দেখালেন "স্ত্রীর পত্র"-এর (১৩২১) স্বামীর চরণাশ্রয়ছিন্ন মৃণালকে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ সমাজনীতির মহিমা ও জীবনের স্থির মূল্যবোধের প্রশ্ন তুলেই ক্ষান্ত হলেন না, তার ভিত্তিতে ধ্বংসাত্মক খননকার্য চালিয়ে দুঃসাহসিক নেতৃত্ব দিয়ে গেলেন। শরৎচন্দ্রও পিছিয়ে রইলেন না-'চরিত্রহীনে'র (১৯২৭) কিরণময়ী ও 'গৃহদাহের (১৯২০) অচলাকে তিনি উপস্থাপিত করে প্রেমের শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং ব্যক্তিনীতির নতুন সত্যকে স্থায়িত্ব দিলেন। তাঁর হাত ধরে গণিকার প্রেমও বাংলা উপন্যাসের রাজসভায় এসে উপস্থিত হলো। কল্লোলের লেখকদের এই দুঃসাহস বাংলা সাহিত্যের নতুন পথ নির্মাণ করে দিয়েছিল। জীবেন্দ্র সিংহরায় লিখেছেন :

> "কল্লোল-পূর্ববর্তী কালে এই নারী-সমস্যা সামাজিক বিদ্রোহ ও যৌনবাস্তবতার রূপ নেয় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের গল্প উপন্যাসে। নরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়ে"র ঢঙে লিখলেন "ঠানদিদি" (১৯১৮), 'শুভ্রা' (১৯২০),'শাস্তি' (১৯২১), 'পাপের ছাপ' (১৯২২), 'দত্তগিন্নী', 'দ্বিতীয় পক্ষ' (১৯১৯), 'অগ্নিসংস্কার' (১৯২০) ইত্যাদি কাহিনীতে নর-নারীর জীবন ও নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে তিনি সাহসিক মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেন। বিবাহিতা নারীর স্বামী-গৃহ ত্যাগ ও প্রণয়ীর নিকট আত্মসমর্পণ, প্রৌঢ়া নারীর পরপুরুষে গোপন আসক্তি, যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাপাচারের চিত্র রচনায় তিনি প্রায় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার বশবর্তী হয়ে এক ধরনের আধুনিকতার প্রবর্তন করলেন।[১৯]

যৌনতা মানুষের জীবনের একটি স্বাভাবিক বিষয়। তাকে এড়িয়ে যাওয়া মানে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে এড়িয়ে যাওয়া। কল্লোলের লেখরা সেটা করেননি। যদিও তাঁদের পূর্বসূরীরা প্রেমভাবনায় এবং নর-নারীর যুগল জীবনের কথা বলতে গিয়ে শরীরের চেয়ে আত্মার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর জোর দিয়েছেন বেশি। কিন্তু নতুন লেখকরা জীবনের ছবি আঁকতে শুধু আত্মার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে দেহাতীত প্রেমের কথা না বলে যৌন জীবনের বাস্তবতার ছবি এঁকেছেন নির্মোহভাবে। এক্ষেত্রে তাঁদের সাহস জুগিয়েছিল প্রায় সমকালীন কিছু বাঙালি লেখক এবং একইসাথে বিদেশী লেখকও। সমকালীন যুগভাবনায় যৌন-জীবন, পাপ-পুণ্যবোধের নবতম ভাবনা সম্পর্কে লেখক লিখেছেন :

> "আধুনিক কালে বিজ্ঞান এ প্রসঙ্গে চিরকালের পাপ-পুণ্য ও যুগানুগ নীতি-দুর্নীতির প্রশ্নটাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। একালে সম্ভোগ-চরিতার্থতা ও ইন্দ্রিয়জ আনন্দ জীবনের সার্থকতার অঙ্গ, তাতে পাপের প্রশ্ন ওঠে না। বরং এই শারীরপ্রবৃত্তিকে চেপে রাখলে গোপন সুড়ঙ্গপথে সামাজিক দুর্নীতির জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। তাই আধুনিক প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিজ্ঞান সম্ভোগের বিষয়টাকে জীবনের প্রকাশ্য অঙ্গনে এনে দাঁড় করাবার পক্ষপাতী। তবে সমস্যা হচ্ছে এইখানে যে সম্ভোগের সঙ্গে প্রজননের সম্ভাব্যতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং সেই সম্ভাব্যতাকে কতটা রোধ করে রাখা যায় সেদিকেই বিজ্ঞানের লক্ষ্য সমধিক। 'কল্লোলগোষ্ঠী' তাঁদের সৃষ্টির আসরে দৈহিক সম্ভোগস্পৃহাকে কতকটা প্রকাশ্য করতে চেয়েছিলেন এবং প্রেমের ক্ষেত্রে দৈহিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া যে অবান্তর নয় এ কথাটি প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী ছিলেন। তাতে পাপ যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে আদি

পাপ এবং তাকে এড়িয়ে যাওয়া মানুষের সুস্থ দৈহিক চাহিদার ক্ষেত্রে সম্ভব বা উচিত নয়। তাই কল্লোলীয়রা সামাজিক 'চুপ-চুপ নীতি' উপেক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। সমাজের জবরদস্তিমূলক নীতিতে এবং তারই অনিবার্য পরিণামে গোপন অসংযমে আমরা সেক্সকে যে বিষ করে তুলেছি তা দেখাতে গিয়ে তাঁরা আঁকলেন রোগ ও বিকৃতির চিত্র। সুতরাং এটা স্পষ্ট, যে, 'কল্লোল গোষ্ঠী' সেক্স বা যৌনতার আলোকে জীবন ও সমাজের শুভাশুভের প্রশ্নটাকে নতুন করে যাচাই করতে চাইছিলেন। অবশ্য তাঁদের দৃষ্টি পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ছিল না, অনেকটা ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা যৌন-জীবনের ছবি এঁকেছেন বলে সেগুলো কতকটা বিকৃতির দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।"[২০]

মাত্র সাত বছরের জীবনকালে কল্লোল যেমন কিছু ভক্ত গ্রাহক, লেখক, পাঠক সংগ্রহ করতে পেরেছিল, তেমনি সৃষ্টি করতে পেরেছিল কিছু শত্রু ও কঠোর সমালোচক। বিশেষকরে সজনীকান্ত দাস এবং তাঁর সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সাহিত্যে অশ্লীলতা, যৌনতত্ত্ব, দুর্নীতি ও পারিবারিক সম্পর্কের অসম্মান ইত্যাদি এবং তার সাথে কর্ম ও স্টাইলের বিশৃঙ্খলার অভিযোগ তুলে একদিকে শনিবারের চিঠিতে তীব্রভাষায় সমালোচনা শুরু করলেন, অন্যদিকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে নালিশ জানালেন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তের চিঠির উত্তরে নিজের শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক ক্লান্তির কথা বলে আপাত চুপ থাকলেও সেই রবীন্দ্রনাথের অভিভাবকত্বে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে দুইদিন ব্যাপী শালিশ-বৈঠক বসেছিল।[২১]

সজনীকান্তের আশা ছিল রবীন্দ্রনাথ নব্য লেখকদের খনিকটা তিরষ্কার করবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রকৃতি, আদর্শ, চিরকালীন বৈশিষ্ট্য, নিজের সাহিত্যরুচি ইত্যাদি বিষয়ে চমৎকার বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। নতুন লেখকদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরক্তিতো নয়ই বরং অশেষ স্নেহ ও শ্রদ্ধা ছিল। তাঁদের অনেকের মধ্যে তিনি বড় লেখকের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের সেই ভবিষ্যৎ ভাবনা কতটা অভ্রান্ত ছিল রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা সাহিত্য তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র ও নানাভাবে নিপীড়িত। তারা বর্ণগত ও অর্থগত উভয় অর্থেই অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত। আমাদের লেখক-সাহিত্যিকদের কাছে তারা যথার্থ সুবিচার এতকাল পায়নি। তাদের প্রতি লেখকদের অবজ্ঞা না থাকলেও অজ্ঞতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ লেখক মনুষ্যত্বের অবমাননাকে সহ্য করেননি, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তবে তাঁদের দৃষ্টি ছিল প্রধানত সামাজিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনবিন্যাসের দিকে। কল্লোলের নতুন লেখকরা এতোকালের উপেক্ষিত দিগন্তের দিকে দৃষ্টি ফেলেছিলেন। কুলি, মুটে, মজুরসহ নিম্নবিত্তের সাধারণ মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বের বয়ান উঠে এলো তাঁদের লেখায়। কল্লোলের পাতায় দেখা গেল এতোকালের অনালোচিত অনালোকিত মানুষের ভিড়। যারা ছিল পেছনের অন্ধকারে নিমজ্জিত, তারা উঠে এলো লেখকের চেতনায়, সৃষ্টিতে। কল্লোলীয়রা কল্লোলের পাতায় সবাইকে স্থান দিয়েছিলেন। তবে তা লেখকের দৃষ্টি ও সৃষ্টির প্রয়োজন অনুযায়ী। ধনী-নির্ধন, মধ্যবিত্ত, জমিদার-ব্যবসায়ী, কুলি-মজুর-চাষী, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান, ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শুদ্র, নারী-পুরুষ সবাই

আছে সেখানে। সমস্ত শ্রেণি-পেশার মানুষ নতুন অর্থ নিয়ে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে এসে মিলেছেন। সেদিক থেকে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের জনচেতনার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক তাৎপর্য নিঃসন্দেহে সুদূরপ্রসারী।

উপসংহার

কল্লোল পত্রিকা, কল্লোলের আড্ডাধারী এবং লেখকগোষ্ঠী পরবর্তীকালের সাহিত্যে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন তা সহজেই অনুমেয়। স্বকালে কল্লোলের সাহিত্যরুচি ও আদর্শ নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও কালান্তরে আমরা দেখি পরবর্তী লেখকরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। যে নতুনের বার্তা এবং যৌবনের দীপ্তি নিয়ে কল্লোল আবির্ভূত হয়েছিল মাত্র সাত বছরের আয়ুষ্কালে তাঁর স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। 'কল্লোল' বন্ধ হওয়ার দুইদশক পরে কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন–

> "'কল্লোল' উঠে যাবার পর কুড়ি বছর চলে গেছে। আরো কত বছর চলে যাবে, কিন্তু ওরকমটি আর 'ন ভূতো ন ভাবী'। দৃশ্য বা বিষয়ের পরিবর্তন হবে দিনে-দিনে, কিন্তু যে যৌবন-দীপ্তিতে বাংলা সাহিত্য একদিন আলোকিত হয়েছিল তার লয়-ক্ষয়-ব্যয় নেই-সত্যের মত তা সর্বাবস্থায়ই সত্য থাকবে। যারা একদিন সে আলোক- সভাতলে একত্র হয়েছিল, তারা আজ বিচিত্র জীবননিয়মে পরস্পর- বিচ্ছিন্ন-প্রতিপূরণে না হয়ে হয়তো বা প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত-তবু, সন্দেহ কি, সব তারা এক জপমালার গুটি, এক মহাকাশের গ্রহতারা । যে যার নিজের ধান্দায় ঘুরছে বটে, কিন্তু সব এক মন্ত্রে বাঁধা, এক ছন্দে অনুবর্তিত। এক তত্ত্বাতীত সত্তা-সমুদ্রের কল্লোল একেক জন। বাহ্যত বিভিন্ন, আসলে একত্র। কর্ম নানা আনন্দ এক। স্পর্শ নানা অনুভূতি এক।"[২২]

তরুণ লেখকদের সীমিত অভিজ্ঞতা এবং নতুন জীবনাদর্শ নিয়ে কল্লোলের পাতায় যে লেখা সেদিন প্রকাশিত হয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যে পালাবদলের মহড়া দিয়েছে। মহড়ার পরের কাহিনী হচ্ছে আসল কথা, সেখানেই সত্যাসত্য যাচাই হয়। তাই কল্লোলের ভূমিকার ঐতিহাসিক মূল্য খুঁজতে হবে শুধু তার সাত বছরের জীবনকালের মধ্যে নয়, কল্লোলোত্তর বাংলা সাহিত্যের মধ্যে। কল্লোলের শতবর্ষে এসে আমরা দেখছি কল্লোল পরবর্তীকালের লেখক সেই পথে হেঁটেছেন কিংবা হাঁটছেন এখনো।

তথ্যপঞ্জি

১. জীবেন্দ্র সিংহরায়, কল্লোলের কাল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ.২৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ.২৭

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬

৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭

৫. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, এম,সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ.৮২

৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪

৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩

৮. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩১-১৩২

৯. জীবেন্দ্র সিংহরায়, পৃ.৯৭

১০. বুদ্ধদেব বসু, বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৭

১১. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.৪৭

১২. কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই কবিতাটি (কবি-নাস্তিক) 'কল্লোল' পত্রিকা ১৩৩১ মাঘ ১০ম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩. জীবেন্দ্র সিংহরায়, পৃ.৯৭

১৪. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

১৫. নির্বাচিত সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৯৫০), সম্পাদনা-অবিন্দম করিক, সুনীল নন্দী ও সৌমেন কুমার বেরা, পূর্ণ প্রতিমা, কলকাতা, ২০২১, পৃ.৩০৯

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৯

১৭. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ.৩-৪

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৯-২৮০

১৯. জীবেন্দ্র সিংহরায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫

২০. প্রাগুক্ত, পৃ.৯৯

২১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

২২. প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৫

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume-V, Issue-II December 2023

ISSN: 2664-228X (Print)
ISSN: 2710-3684 (Online)

Government
Brajalal College
Khulna
Bangladesh

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

Contents

English Section

- Exploring Eco-tourism Treasure of North-eastern States of India: A Sustainability Perspective
  Dr. Suman Kalyan Chaudhury, Dr. Sukanta Sarkar & Dr. Manaswini Patra 55-68
- Abandoned at Old Age: Aging in Contemporary Nepali Short Fiction
  Komal Prasad Phuyal, PhD 69-80
- Exploring Domestic Violence and Child Abuse in Select Novels of Toni Morrison
  Roxana Khanom 81-91
- Genocide and Ecological Ruin in Amitav Ghosh's *The Nutmeg's Curse: Parables for a Planet in Crisis*
  Kamal Sharma 92-111
- Ecocritical Reading in Select Works of Rabindranath Tagore
  Professor Sharif Atiquzzaman 112-117

Volume -V, Issue-II, December 2023

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2023v5i2eg1
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -V, Issue-II, December 2023
Pp. 55-68

Exploring Eco-tourism Treasure of North-eastern States of India: A Sustainability Perspective

Dr. Suman Kalyan Chaudhury, Dr. Sukanta Sarkar & Dr. Manaswini Patra

Dr. Suman Kalyan Chaudhury
Faculty Member, P.G. Department of Business Administration, Berhampur University, India
e-mail: sumankchaudhury72@gmail.co

Dr. Sukanta Sarkar
Associate Professor
Department of Economics
Gambella University Ethiopia
e-mail: sukantaeco@gmail.com

Dr. Manaswini Patra
Asst. Librarian
R. P. Padhi Library
Berhampur University, India
e-mail: manaswinibbsr@gmail.com

Abstract

The North-eastern states of India are blessed with beautiful natural landscapes, flora and fauna, folk music, mountains, mysterious clouds, cuisines, and tribal culture, making it unique for eco-tourism. The region has enormous scope for the growth of eco-tourism, with many wildlife sanctuaries and national parks, local arts and crafts, and fairs and festivals that can attract more tourists from home and abroad. This beautiful region abounds with adventurous activities like jungle safari, trekking, pilgrimage tours, mountaineering, tea garden tours, and ornithological tours are also available. However, transportation, accessibility, security threats, tourist facilities, hygienic food, accommodation, tourist information systems, system of permission, and brand image are the basic challenges before its tourism sector. Through a descriptive analysis, this paper discusses the opportunity and scope of sustainable eco-tourism in the North-Eastern states of India.

Keywords

Ecotourism, Homestay, Hotels, Tribal communities, Tourist

Introduction

Ecotourism is a nature-based activity that attracts people to certain scenic places of nature. Such activities are economically, ecologically, and socially sustainable and

helpful for the well-being of the local people and the conservation of the areas. Local people benefited through such activity without affecting their culture and customs. Sustainable ecotourism benefits both the visitors and the locals. Since it is based on certain principles, like (a) awareness about the culture and environment; (b) reducing the social, psychological, and behavioural effects; (c) conservation of nature, and (d) empowerment of local communities as management of waste and preservation of nature are an integral part of the ecotourism. There are many benefits of eco-tourism, like generating revenue that can be used for the development of nature and local communities; (b) creating employment opportunities among the locals that can be useful for fighting against poverty and unemployment; (c) increasing environmental awareness among the tourists and local people; and (d) helping to enhance biodiversity, and conservation of nature (Zimik and Barman, 2021).

Ecotourism can be classified in four ways: These are (a) Mutually beneficial community development trips: where a traveller lives with the local communities to collect more and more information about their culture and lifestyles and simultaneously works for the welfare of the local people. (b) Eco lodging and low-impact accommodation in natural surroundings with little disturbance to the local people and the wildlife as these accommodations are generally prepared using the local resources with the caution of using limited resources. (c) Eco trekking and activity-based ecotourism is a type of educational tour where travelers visit various places and involve themselves in climbing, hiking, water-based activities, nature walking, etc. carried out with minimum harm to nature. and (d) Agritourism and a focus on rural communities where travelers visit the rural areas to enrich their understanding of the local life and culture.

Ecotourism upsurges awareness about nature among travelers. It increases the opportunities for jobs and boosts the rural economy. It encourages governments, charitable organizations, and other enterprises for the conservation of nature (Saikhom, 2021).

The term tourism was introduced in the 19th century and was associated with sustainable tourism. Sustainable tourism is involved with the development of both the present and future generations. Tourism means the movement of people outside their houses to visit various places. It is considered a bigger industry in terms of employment and foreign exchange earnings. It is useful for improving communications among people

and solving various social disputes. It is useful for increasing the conservation of nature and economic growth. Travelers can witness the beauty of the natural environment and also learn about the culture of the ethnic people living in its lap. It can be useful for promoting the nature and culture of people. India's diversified culture and natural beauty open the opportunities for development of ecotourism. Lakshadweep Islands, North-East India, Kerala, the Himalayan region, and Andaman and Nicobar Islands have an enormous scope for the growth of ecotourism (Rubita, 2012).

Objective of the Study

This paper is explorative. The basic objectives of the paper are as follows:

1. To have an insight into the opportunity of sustainable eco-tourism in the North-Eastern States of India.
2. To identify the basic challenges before the tourism sector of the states of India and
3. To identify the variables of the SWOT Matrix for tourism in the northeastern states.

Opportunity and Scope of Sustainable Eco-Tourism

Northeastern states of India are well-known for their beautiful natural landscapes. Hills and mountains dominate the region. This region constitutes the eastern part of the Himalayas. Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Tripura, Sikkim, and Nagaland are the eight states of the region. These are well blessed with flora and fauna, folk music, landscapes, mountains, mysterious clouds, cuisines, etc. However, connectivity due to geographical isolation is a big challenge to the tourism sector of the region. There is also an impression among the outsider that this region is not safe and secure for them to visit in contrast these states are more peaceful like their natural beauty. There are many wildlife sanctuaries and national parks in the region. The specialty of the heritage of this region is the tribal culture. Many people visit this region to understand the tribal people and their indigenous culture. Local arts and crafts of them are different. Fairs and festivals can be useful for attracting more tourists. The Hornbill festival of Nagaland is a perfect example of this. Adventurous activities, jungle safari, trekking, pilgrimage tours, mountaineering, tea garden tours, ornithological tours, etc. opened the massive scope for ecotourism (Priya and Dhiren, 2016).

Table 1: Overview of the North-Eastern Region of India

States	Airports	Area[1]	Population[2]	Literacy rate[3]	Railway (Km)	Waterways (Km)
Arunachal	4	83,743	1,383,727	65.38	12	311
Assam	7	78,438	31,205,576	72.2	2519	1938
Manipur	1	22,327	2,855,794	76.9	13	44
Meghalaya	1	22,429	3,366,755	74.4	9	90
Mizoram	1	22,081	1,097,206	91.33	2	155
Nagaland	1	16,579	1,978,502	79.55	11	276
Sikkim	1	7,098	610,577	81.24	0	-
Tripura	1	10,486	3,673,917	87.8	193	-
Total	17	263181	46,172,054	78.59	2759	2814

Source: Economic survey of the States; Note:[1] as Sq. Km; [2] as per 2011 census report; [3] as percent;

The above table (1) discusses the topography of the north-eastern region of India. It has been found that Arunachal Pradesh is the largest state in terms of geographical area, but Assam is the largest state in terms of population. Assam and Arunachal Pradesh have more airports than the other states. Except for Sikkim, railway connectivity is available in every state. Water transport is possible in north-eastern states except Sikkim and Tripura. Lack of proper Transportation and accessibility, threats, tourist facilities, hygienic food, accommodation, tourist information system, a system of permission, brand image and security threats, etc. are the basic challenges before this sector of the region. Heavy rains, thick jungle tracks, and rivers like the Brahmaputra and Barak have shaped the economy, lifestyle, and ecology of the region. Assam is more popular among the tourists. It attracts more tourists due to its good connectivity and unique natural places. Nagaland is the least tourist-visited state. Mawlynnong village in the East Khasi Hills district of Meghalaya is the cleanest village in Asia. Villagers are more concerned about the conservation of nature. Umden is the village of Ri-Bhoi district of Meghalaya and is known as a sericulture hub and well-known for the production of silk and famous for its orchards and green fields. Majuli in Assam is popular among tourists as being the largest riverine island in India. Every year thousands of tourists visit this place. Raas is the main festival of the island. Namphake village of Assam is a perfect place for ecotourism as the Tai-Phake tribe lives in the place. It is situated on the south bank of the Buridihing River. Touphema of Nagaland is a well-known place for community-based tourism. The village was built for travelers to understand the lifestyle

and history of the people of the place (Phukon et. al., 2020).

Loktak Lake in Manipur has more opportunities for ecotourism. It is a floating lake near its capital Imphal. It is the largest freshwater lake in India. The lake supports the livelihood of thousands of people as it absorbs the flood water in rainy seasons. Dzongu in North Sikkim is another destination for the tourists. This place is reserved for the Lepcha tribal community. They enjoy their unique culture, customs, and language. The village is near the Teesta River. The region is famous for various unique handicraft products. Handicraft and bamboo goods are traditionally produced by the local tribes. These products include the Lashingphee of Manipur, Carpets of Arunachal Pradesh, Muga products of Assam, are Shawls of Mizoram are examples of some unique products. Manas National Park and Kaziranga National Park have more scope for ecotourism. The Manas Wildlife Sanctuary is situated in Assam which is a hotspot of biodiversity. Kaziranga National Park is situated in Nagaon and Golaghat district of Assam. This park is well-known for its one-horned rhinoceroses. It was included in the list of World Heritage Sites in 1985. The ethnic landscape of the region is useful for other tourism, like mountain tourism, folklore tourism, tribal tourism, anthropological tourism, tea tourism, and ethnic tourism. Nameri National Park of Assam is situated in the foothills of the eastern Himalayas. It is a paradise for birdwatching with its unique biodiversity (Karmakar, 2023).

Khonoma is an Angami Naga village in Nagaland and it has a green village tag. The Khonoma Nature Conservation and Tragopan Sanctuary were established in 1998 for the development of the place. Yuksom is a historical town of Sikkim which is famous for its green and charming climate. It is surrounded by high hills and lush green forests. Kanchenjungha National Park of Sikkim is popular among trekkers. Thembang is a beautiful ancient village in West Kameng district of Arunachal Pradesh. Community-based eco-tourism has been introduced in the village. Eaglenest Wildlife Sanctuary is situated in the West Kameng district of Arunachal Pradesh. It is known for its diverse animal population. There are many rare animal and bird species in the sanctuary. Khumulwng eco-park of Tripura is situated in the Baramura hill range having a unique panoramic environment. Khumulwng in tribal language means “valley of flowers”. It is surrounded by green forests and river valleys. The Ziro Valley of Arunachal Pradesh has plenty of natural elements for tourist interest and attractions. This valley is surrounded

by blue pine and bamboo plantations. The other important attractions of this locality are the Hakhe Tari Trek, Talley Valley Trek, Pamu-Yalang Trek, Bird Watching Expedition, and Ziro Butterfly Meet. The Talley Valley Wildlife Sanctuary is another place of attraction in Arunachal Pradesh. It has a unique and endangered but diverse range of flora and fauna (Joshi & Dhyani, 2009).

Table 2: Wildlife Sanctuaries and their specialty for Ecotourism in Assam

Name	Area (sq. km)	District	Specialty
Morat logri	451	Karbi Anglong	Wild Pig, Woodland Bird, Rock Python
Borail	326.26	Cachar	Himalayan Black Deer, Horn Bill, Clouded Leopard
Amcheng	78.64	Kamrup	Vulture, Python, Cobra, Butterflies
Nambor	97.15	Golaghat	Elephant
Gibbon	20.98	Jorhat	Hoolock Gibbon, Birds
Barnadi	26.22	Udalguri	Pigmy Hog, Elephant, Hornbill, Hispid Hare
Burha sapori	44.06	Sonitpur	Water Buffalo, Aquatic Bird, Bengal Florican, Rhino
Nambar	325.25	Karbi anglong	Elephant And Hoolock Gibbon
Garampani	6.05	Golaghat	Elephant, Hoolock Gibbon And Birds
Sonai rupai	220.00	Sonitpur	Tiger, Elephant, Hornbill
Chakrashila	45.56	Dhubri and Kokrajhar	Golden Langur And Aquatic Bird
Bherjan-Podumoni	7.22	Tinisukia	Hoolock Gibbon, Pigtailed Macaque, Stump Tailed Macque
Laokhowa	70.13	Nagaon	Wild Buffalo, Swamp Deer, Duck, Cormorant, Rhin
Pobha	49	North lakhimpur	Wild Water Buffalo
Pobitora	39	Morigaon	One Horned Rhino, Leopard, Tiger

Source: Statistical Handbook of Assam.2021

The table (2) discusses the wildlife sanctuaries and their specialty for ecotourism in Assam. It has been observed that wildlife parks and sanctuaries are scattered in various districts of Assam providing ample opportunity for ecotourism. Nameri National Park (Assam), Dibru-Saikhowa National Park (Assam), Orang National Park (Assam), Pobitora Wildlife Sanctuary (Assam), Namdapha National Park (Arunachal Pradesh), Mouling National Park (Arunachal Pradesh), Dampa Tiger Reserve (Mizoram), Fakim

Wildlife Sanctuary (Nagaland), Balpakram National Park (Meghalaya), and Singchung Bugun Village Community Reserve (Arunachal Pradesh) are the examples of some wildlife parks and sanctuaries. There is also a growing scope for ecotourism based on the tea plantations in the region. Tea plantation gardens are found more or less in every state of the region. Jorhat, Tinsukia, and Dibrugarh in Upper Assam are well known for their tea plantation. In the Lower Assam, tea gardens are available in Barpeta and Goalpara. Ambikanagar tea estate and the Bhuban Valley tea estate are popular in the Cachar district of Assam. The Tripureswari Tea Estate and the Hiracherra Tea Estate are renowned in Tripura. Mawlyngot Tea Estate and the Lakyrsiew Tea Estate are well-known in Meghalaya. Temi Tea Estate is popular in Sikkim (Bressers, 2004).

Table 3: List of Register Homestay in Ziro, Arunachal Pradesh

Name of Homestay owner	Location	Contact No
Miss Takhe Ankha	Hong Village	+91 8575770952
Smti Narang Yamyang	Hong Village	+918014012680
Mr Takhe Nyikang	Hong Village	+91 8014068697
Miss Dusu Yami	Perbi, Ziro	+919856347746
Miss Hage Anu	Hari village	+918794363633
Shri Hage Dolo	Hari village	+919615239954
Shri Hage Hinda	Hari village	+918014526454
Shri Tasso Rinyo	Hari village	+918729904079
Smti Hibu Yache	Siiro village	+918575052646
Smti Kago Kampu	Siiro village	+918014348727
Smti Punyo Yalung	Siiro village	+919856209494
Smti Nada Yasha	Hija village	+918974100539
Smti Pura Yanya	Hija village	+918014647860
Shri Michi Tajo	Michi village	+918014012558
Shri Mudang Rosy	Mudang Tage village	+918794405047
Shri Tamo Tamang	Bamin village	+919862890096
Smti Talying Shanti	Suluya village	+919615170002
Smti Tiling Yaneng	Ziro village	+918974384507
Smti Hinyo Amung	Ziro village	+918132861756
Shri Koj Mama	Hapoli village	+918575248013

Source: Mize, T., Kanwal, K., Rangini, N., Yama, L., Patuk, O., and Lodhi, M. (2016). The Current Development of Ecotourism in Ziro Valley and its significance in Arunachal Pradesh, India, IJARIIE, 2 (6), 1740.

The above table discusses the registered homestay in Ziro, Arunachal Pradesh. Ziro is a hilly station in Arunachal Pradesh. It has been found that homestay facilities are

available in this town. Such facilities are available in Hong Village, Hari Village, Hapoli Village, Ziro Village, Suluya Village, Bamin Village, Mudang Tage Village, Michi Village, etc. Ziro is the capital of the Lower Subansiri District. There are possibilities for the growth of ecotourism based on adventure tourism in the region. River rafting, mountaineering, and trekking are also possible. Some examples of adventure tourism activities in the region are trekking in the Dzukou valley, white water rafting in the Brahmaputra River, paragliding in Sikkim, mountaineering in Arunachal Pradesh, caving in Meghalaya, biking in the Ziro valley, and angling in the rivers of Arunachal Pradesh. Manipur is another beautiful State in this region. Manipur is known as the land of jewels in the Northeast India. The state is popular for its cultural festivals which attract lots of tourists. The popular festivals are Chumpha, Ningol Chakhouba, Rasa Lila, Kut Festival, Heikru Hitongba, Ratha Jatra, Cheiraoba, Lai-Haraoba, Yaoshang (Doljatra), Lui-Ngai-Ni etc.

Table 4: Protected Area Network for Ecotourism in Manipur

Protected Area (conservation)	District	Area (Sq. Km)
Keibul Lamjao NP (In-situ)	Bishnupur	40.00
Yangoupokpi Lokchao WLS (In-situ)	Chandel	184.80
Bunning WLS (In-situ)	Tamenglong	115.80
Zeilad WLS (Insitu)	Tamenglong	21.00
Kailam WLS (Insitu)	Churachandpur	187.50
Jiri-Makru WLS (In-situ)	Tamenglong	198.00
Shiroi NP(In-situ)	Ukhrul	797
Manipur Zoological Garden (Ex-situ)	Imphal West (Iroishemba)	0.08
Second Home of Sangai (Ex-situ)	Imphal West (Iroishemba)	0.06
Orchid Preservation Centre (Ex-situ)	Imphal East (Khonghampat)	0.50

Source: Alam, W. (2019). A Review on the Scopes of Ecotourism in Manipur: An Approach for Environmental Conservation, International Journal of Scientific Research and Reviews, IJSRR, 8 (1), 176-177.

The table (4) discusses the protected area network for ecotourism in Manipur. Manipur is blessed with gurgling rivers, rolling meadows, emerald mountains, and foaming waterfalls. The state is famous for its scenic beauty, rich flora and fauna, lush green plains and hills, salubrious climate, floating national parks, wetlands, and lakes. Manipur is the land of the Meitei, Kuki-Chin-Mizo, Nagas, and Gorkhas. Shiri-Kashong range is enriched with endangered species. There are various old caves like Khangkhui caves, Mongjam caves, Tharon cave, Sangbu caves, Nongpok Keithelmanbi caves, and Wangoo

caves are popular caves in Manipur. Barak Waterfall, Khayang Waterfall, Alng Takhou Waterfall, Dilily Waterfall, Ngaloi Falls, Bro Waterfall, Ishing and Thingbi Waterfall are the important waterfalls in the state. Andaro is a beautiful ancient village having the dolls of 29 recognized tribes of Manipur. Khongampat Orchidarium is popular among the tourists. It is the breeding center of 110 species of orchids. Singda is a beautiful hill station near Singda Lake. Loktak Lake and Sendra Island are well-known among tourists. Kroubu-Ching, Thangjing-Ching, and Nongmaiching-Ching are the traditional eco-tourism centers of the State.

Ecotourism plays a vital role in the Tripura tourism industry. Lush green landscapes and diverse flora and fauna make the state a unique place for tourists. The state has many national parks and sanctuaries. Sepahijala Wildlife Sanctuary, Trishna Wildlife Sanctuary, Rowa Wildlife Sanctuary, Baramura eco-park, Gomati Wildlife Sanctuary, Kalapania Nature Park, Tepania eco-park, and Khumulwng eco-park are the popular ecotourism places of Tripura. Mizoram is another state in the region that has more potential for ecotourism. Tamdil Lake, Champai, Lunglei, Vantawng Water Falls. Bung and Paikhai are popular among tourists. Phawngpui and Dampa wildlife sanctuaries are the best places for trekking and wildlife viewing. Phawngpui is known as the Blue Mountain. It is a reserved place for rare exotic plants and medicinal herbs. Dampa is a popular wildlife sanctuary surrounded by Bangladesh, Mizoram, and Tripura. Champai is a small town near the Myanmar border. It is well-known for its natural beauty.

Table 5: State-wise domestic and foreign tourist visits in North-eastern States of India, 2020-21

State	2020		2021		Growth Rate (%)	
	Domestic	Foreign	Domestic	Foreign	DTV 21/20	FTV 21/20
Arunachal Pradesh	42871	961	102915	182	140.06	-81.06
Assam	1266898	7285	1409161	536	11.23	-92.64
Manipur	49669	3139	49371	648	-0.60	-79.36
Meghalaya	24734	2311	154409	411	524.28	-82.22
Mizoram	30890	265	87232	234	182.40	-11.70
Nagaland	10979	518	23968	325	118.31	-37.26
Sikkim	316408	19935	511669	11508	61.71	-42.27
Tripura	127815	31877	177816	5	39.12	-99.98

Source: India Tourism Statistics, 2022, p.139.

Table (5) discusses the state-wise domestic and foreign tourist visits to the northeastern states of India. It has been found that Assam, Sikkim, and Tripura are attracting more and more tourists than the other states. Nagaland is the least popular among the tourists, preceded by Meghalaya, Mizoram, and Manipur. There are more potentialities for ecotourism in the Arunachal Pradesh. More than 500 species of birds are found in the state. Each district of the state has a rare variety of orchids. There are many wildlife sanctuaries and natural parks in the state, like Namdapha Wildlife Sanctuary, Dihang Debang Biosphere Reserve, Mehao Wildlife Sanctuary, Dr. Daying Ering Memorial Wildlife Sanctuary, Mouling National Park. Kane Wildlife Sanctuary, Eaglenest Wildlife Sanctuary, Pakhui Wildlife Sanctuary, and Sessa Orchid Sanctuary. The state has five major rivers (Tirap, Siang, Lohit, Subansiri, and Kameng) and the majority of the population are tribals. Aalo is the capital of West Siang District and the ideal place for trekking, angling, and hiking. Pashighat is the capital of the East Siang district and is surrounded by snowclad peaks and the tributary of Brahmaputra. Dong Valley is the place from where people can see the first Sunrise of the country. Namsai is well known for the natural beauty and biodiversity of the Piyong Reserve forest. Yingkiong is the capital of the Upper Siang district and is popular for its beautiful landscape and natural beauty. Koloriang is the capital of the Kurung Kumey district, and travellers can enjoy the culture of the Nyishi community. Seppa is the capital of the East Kameng district and is situated on the bank of Kameng River. Tawang is a popular hill station. It is well-known for various Buddhist cultural places.

Table 6: Percentage shares and rank of different North-eastern States of India in domestic and foreign tourist visits, during 2021

State	2021		Percentage Share		Rank 21	
	Domestic	Foreign	DTV	FTV	DTV	FTV
Arunachal Pradesh	102915	182	0.02	0.02	33	32
Assam	1409161	536	0.21	0.05	23	27
Manipur	49371	648	0.01	0.06	35	26
Meghalaya	154409	411	0.02	0.04	31	28
Mizoram	87232	234	0.01	0.02	34	31
Nagaland	23968	325	0.00	0.03	36	29
Sikkim	511669	11508	0.08	1.09	25	13
Tripura	177816	5	0.03	0.00	30	36

Source: India Tourism Statistics, 2022, p.141.

The above table discusses the percentage shares and rank of different north-eastern states of India. It has been found that the highest number of domestic tourists visited Assam, followed by Sikkim, and Tripura. The least number of domestic tourists visited Nagaland, preceded by Manipur, and Mizoram. The highest number of foreign tourists visited Sikkim, followed by Manipur, and Assam. The least number of foreign tourists visited Tripura, preceded by Arunachal Pradesh, and Mizoram.

Meghalaya is blessed with the beauty of nature as there are more opportunities for ecotourism, adventure tourism, cultural tourism, and agri-tourism. There are scopes for hard and soft tourism activities. A Traveller can be involved in hard tourism, like rock climbing, trekking, caving, etc. Soft adventure tourism involves bird watching, eco-tour, fishing, boating, etc. Tourists can avail the homestay and homely stay in local resorts. Travelers can be involved in barn dances, campfires, meeting barnyard animals, breweries, etc. Khasi Hills, Jaintia Hills, and Garo Hills have an abundance of natural heritage. Sohpetbneng Peak, Spread Eagle Falls, Sweet Falls, Nongkhnum Islands, Kyllang Rock, Elephant Falls, Diengieipeak, and Cherrapunjee are the popular places in Khasi Hills. Balpakram National Wildlife Park, Nengkong, Balpakram, Siju caves, Resubalpara, and Wakso are the tourist-interested places of Garo Hills. Bishop and Beadon Falls, Elephant Falls, Sweet Falls, Lmilchang Dare Falls, and Spread Eagle Falls are the waterfalls of the state. Travelers can enjoy Shillong Peak and Tura Peak.

Table 7: Recognized travel trade service provider in the country during 2021-22.

States	Green Shoots/ Start Ups	Tour operators	Travel Agent	Tourist Transport Operator	Total
Arunachal	0	0	0	0	0
Assam	0	2	1	0	3
Manipur	2	2	0	0	4
Meghalaya	0	0	0	0	0
Mizoram	0	0	0	0	0
Nagaland	0	0	0	0	0
Tripura	0	1	0	0	1
Sikkim	0	0	0	0	0

Source: India Tourism Statistics, 2022, p.168.

Table (7) discusses the recognized travel trade service centres in the northeastern States. It has been found that Manipur, Assam, and Tripura provide recognized travel trade services. The other states of the region do not have any recognized travel trade service.

The Himalayan state of Sikkim is well-known for its tourism sector. Leppchas the tribals of the Sikkim call it "Nye-Mal-Ale" or "Heaven". There are many ecotourism zones in Sikkim. Nampong lingdok ecotourism zone, Okharey ecotourism zone, Uttarey ecotourism zone, Lingee Payong ecotourism zone, Lachung ecotourism zone, Lachen ecotourism zone, Kitam ecotourism zone, Khecheopari ecotourism zone, Hee-bermiok ecotourism zone, East Pendam ecotourism zone, and Dzongu ecotourism zone are the examples of them. Opportunities like river rafting, hiking, and trekking are available in the state. Cymbidiums, Hooheriana, Dendrobiums, Cattlelyas, etc. are the famous orchids that originate in the state. Fairy bluebirds like kingfishers, cuckoos, woodpeckers, Emerald Dove, etc. are attractive birds that adore the sky of the state. Sikkim has Khangchendzonga National Park, Fambong Lho Wildlife Sanctuary, and Singba Rhododendron Sanctuary. White water rafting adventure sport is popular in the state. Saikip-Jorethang-Majitar-Melli and Makhna-Sirwani-Bardang-Rangpo are the two popular rafting routes. Homestays with the locals are popular in Sikkim.

Table 8: SWOT Matrix for Tourism of North-eastern States

Strengths	Weaknesses
• Historical and Ethnic commonalities along with a cultural Diaspora • Surrounded by tourist zones of India • Education Index • Strategic Location for Look East Policy • Youthful Population • Strong Local Communities • Natural Resources • Moderate climatic conditions • Local market for handicrafts and handlooms. • The hospitable and friendly behaviour of the people in this region	• Poor connectivity and lack of Infrastructure • Image problem- myths about terrorist activities • Low awareness in the market • Transport and Communication bottlenecks • Lack of network and synergy among public and private organizations • Lack of trained experienced workforce

Opportunities	Threats
• Ecological Resources, Agricultural Development • Vast rural villages • Identifying Niche Area Rural Innovation • Special attention to Northeast India • Vast unexplored rural destinations • Enhancing local workforce training and educating residents about welcoming tourists • The potential for international engagement in introducing and developing the region's tourism attractions.	• Growth of insurgent activities • Economic Backwardness • Extortion network • Ethnic clashes

Conclusion

The tourism industry is considered a bigger industry in terms of employment and foreign currency earnings. It is useful for improving communications among people and solving various social disputes. Ecotourism is useful for increasing conservation and economic growth. Travellers can witness the beauty of the natural environment and also learn about the culture of the ethnic peoples. The specialty of the heritage of this region is the tribal culture. Many people visit this region to learn about the tribal people and their indigenous culture. Adventurous activities, jungle safari, trekking, pilgrimage tours, mountaineering, tea garden tours, ornithological tours, etc. have massive scope for ecotourism.

There are enormous scopes for sustainable ecotourism in the region. There are many wildlife sanctuaries and natural parks in the region. Homestays with the locals are popular in many places in the region. Assam is more popular among the tourists. It attracts more tourists due to its good connectivity and unique natural places. Nagaland is the least tourist-visited state. Loktak Lake in Manipur has more opportunities for ecotourism. There is also the scope for growing ecotourism based on the tea plantations in the region. Tea plantation gardens are available in more or less in every state of the region. Cultural festivals also attract lots of tourists. The ethnic landscape of the region is useful for other tourism like mountain tourism. folklore tourism, tribal tourism, anthropological tourism, tea tourism, and ethnic tourism. Homestays with the locals are popular in Sikkim.

Transportation, accessibility, security threats, tourist facilities, hygienic food, good accommodation, tourist information systems, a system of permission, brand image, etc. are the basic challenges before the tourism sector of the region. Implementation of tourism policies is important for the development of the tourism sector of this region. The government should focus on community involvement, prioritization of the domestic tourism sector, promotion of tourism infrastructure, enhancement of tourist facilities and services, extension of tourism-based education and training, and better management of the sector.

References

1. Bressers, H. T. A. (2004). Implementing sustainable development: How to know what works, where, when and how, In William M. Lafferty, (Ed.), Governance for sustainable Development the Challenge of adopting form to function, Edward Elgar, Northampton MA, 284 – 318.
2. Joshi, R., & Dhyani, P. P., (2009). Environmental sustainability and tourism-implications of trend synergies of tourism in Sikkim Himalaya. Current Science, 97(1), 33-41.
3. Karmakar, D. (2023). Eco-tourism practices in Sikkim. International Journal of Advanced Research in Commerce, Management & Social Science, 6 (1). 69.
4. Phukon, R., Das, P., and Borah, G. (2020). Prospects and barriers of tourism industry in Assam. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology, 11 (12). 3367.
5. Priya, M. and Dhiren, Kh. (2016). An Analytical Study of Ecotourism and its Prospects in Manipur. PARIPEX - Indian journal of research, 5 (3), 448.
6. Rubita, I. (2012). Sustainability Issue in Tourism: A Case Study of Yuksam Village, Sikkim. AJTS, 7 (2). 117.
7. Saikhom, P. (2021). Ecotourism a Boon to the State Manipur: North East India. International Journal of Science and Research, 10 (5), 1138-1140.
8. Zimik, A. and Barman, A. (2021). Whether Northeast India wishes to exploit its Tourism Potential? Some doubts. International Journal of Creative Research Thoughts, 9 (5), 1836.

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2023v5i2eg2
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -V, Issue-II, December 2023
Pp. 69-80

Abandoned at Old Age: Aging in Contemporary Nepali Short Fiction

Komal Prasad Phuyal, PhD

Komal Prasad Phuyal, PhD
Central Department of English
Tribhuvan University
Kathmandu, Nepal
e-mail : ephuyal@gmail.com

Abstract

Contemporary Nepali short fiction has depicted the plight of the people left at home in their old age when the children seek a better life and settlement in the first world. Such people suffer in silence and perpetually wait for their children to return and embrace them. As the national boundaries have not been able to keep people within them, the family has faced the most critical challenges of our time. It has failed to serve the usual expectations as a social institution. The root cause of such abandonment lies in the crises of family. Mandira Madhushree's "Ambako Bot" [The Guava Tree] (2017), Neelam Karki's "Parkhai" [The Wait] (2019), and Bina Theeng's "Aayam" [A Dimension] (2020) picture the people abandoned at their old age: they lead a solitary life in the most critical phase of their life. This paper reads the stories in the contemporary contexts of Nepal in particular and South Asia in general as the developing world has similar kinds of problems. Since the study is built on the assumption that the study of creative texts helps understand the course of action that society has prepared for itself, this paper attempts to examine the content of the elderly self as presented in the selected Nepali short fiction.

Keywords

Aging, elderly people, literary gerontology, Nepali fiction, loneliness

Introduction

After the advancement in healthcare facilities, the world has witnessed an unprecedented rise in the population of elderly people in the first two decades of the twenty-first

century. Many people have carried out various types of research in the domain of health care and other related domains to understand the issues of elderly people. They have also attempted to devise the best facilities for the elderly population to provide them with physical comfort to ease the experience of growing old. However, literary critics have not been able to conduct such research in creative writings as such even though literature possesses the potential to contemplate the issues of elderly people and weaving the narrative of the people undergoing certain complexities, arising from aging. How is the experience of aging for the people of the modern time? How has the old age unfolded in the contemporary times? As the pressing questions of the time, the issues draw the attention of the literary studies towards it. In this study, I have taken three short stories from contemporary Nepal to examine the ways the issues of the elderly people are depicted to discuss the changing socioeconomic structures in the society. Written quite recently, Mandira Madhushree's "Ambako Bot" [The Guava Tree] (2017), Neelam Karki's "Parkhai" [The Wait] (2019), and Bina Theeng's "Aayam" [A Dimension] (2020) have explored a new approach to view the issues of the elderly people: the stories depict the plight of the parents abandoned in their old age. They live a lonely life on their own.

Aging and Elderly People

The issues of elderly people require serious critical attention from academia as they have also remained left out of the mainstream discourses. However, the academia seems to have ignored their issues in the study of contemporary literature as such. In other words, the literary writings that celebrate the questions of the youth and young age have drawn more attention than of the writings with the elderly people. Also, Phyllis Winet Barnum finds out that elderly people are seriously underrepresented in such books. As he explores, "Although the aged made up 9. 3 percent of the population on an average from 1950 to 1959 and from 1965 to 1974, the elderly constituted only 3.3 percent of the main characters, and appear in only 5.3 percent of the illustrations" (303). This sort of findings of the research suggest that this has emerged as a growing field of study requiring serious attention from the practitioners of diverse domains of knowledge. Furthermore, it implies that the people have started moving into the margins under our shadows.

Even though academia did not accept the course of life as a domain of serious studies

earlier, it has evolved into an exciting area of knowledge in modern times. First of all, the knowledge about elderly people helps to explore the key concerns of old age, aging, and the need to understand the problems of old age as such. It also puts the young people in a critical position to realize the fundamental nature of their future: simultaneously, such findings prepare the people to accept the old age gracefully. Reviewing the development of research in the area, Glen H. Elder, Jr. views that the studies in the 1950s focused on ahistorical aspects of human life as the time excessively emphasized objectivity. Gradually, people began to think of the issues differently as they acknowledged the significance of the changing sociological conditions in the modern world (12), resulting in the shift in the ways of scientific studies in the 1960s. By understanding the elderly people, we learn to cope with the issues of the elderly people and see the meaning in our practices in general. Candida Gillis views literature as a way of preparing people for their later life as well since it depicts the condition of living for people of all ages. Specifically, elderly people suffer a lot in their old age and literature becomes a public space to deal with such traits. As she argues, "English teachers are in an excellent position to help students learn about the aged and the aging because they know literature that treats the joys and pains of later life and understand how language shapes and reflects cultural attitudes" (62).

The implication of literary representations of aging goes deeper as Keshab Sigdel argues, "It offers a bridge between the past and present through the alternative documentation of social, cultural, historical, and political experiences that can provide future directions" (106). Generally, teachers of literature can help their students understand aging and old age better by bringing into the spotlight the issues of such groups in the classroom discussion.

Nepali literature has not paid serious attention to the issues of elderly people. The critical scholarship picks the issues of politics or the historical transformation of society in general. The contemporary readings focus more on the power relations existing in society and the contextual forces leading to the production of such writings. Since literature intensively contemplates the inner composition of the human self, the surroundings, and the placement of people in the real context, it began to draw the attention of literary critics and scholars to study the concerns of the elderly population in the 1970s. The advancement in health care also resulted in the rise of the elderly population in the

1970s. As the literary texts pick up characters (people) from society, the elderly people naturally show their presence in such texts. As the social relations imply the political texture embedded in them, the treatment of the elderly people presents a unique world that reveals the deep-seated assumptions, biases, and judgments of the people about this new reality of our time. However, the writings generally presented old age in the stereotypical negative image: failure, inability, fall, loss, decay, and the like were associated with aging. The traditional concept of aging is reflected in such writings that attempt to portray old age as time without any energy in the people.

At present, aging has been rigorously studied in medicine and other domains of biological sciences. Such researchers direct their attention to the issues of energy, the growth of certain types of cells, and the like. On the other hand, the cultural assumptions and perceptions about aging become more prominent for creative artists to produce certain types of texts. Furthermore, the present study focuses on the cultural dimensions of aging as perceived in literary writings: it attempts to explore the cultural dimensions and implications of aging. Valdemiro Sgarbieri and Maria Teresa Bertoldo Pacheco argue that aging is not genetically programmed; rather, external factors like food and nutrients play a vital role in the experience of aging in people (18). Sgarbieri and Pacheo imply that the cultural practices of the people have a great role to play in the experience and understanding of aging in people in any society. Implicitly, such exploration opens up a huge avenue where the political set-up of the whole society becomes visible to the external eyes.

Though creative texts carry a huge corpus of data to understand the political implications of age, aging, and elderly people, this domain remained ignored for a long time. The obsession with the linguistic interpretation of texts inspired the critics to investigate the aspects that appealed to young readers in academia. Even the elder academicians and readers could not devote adequate attention to the field of study. In other words, literary critics have ignored a very fertile domain of exploration of human possibility in literary texts. As Sarah Falcus critically analyzes:

In literary studies, aging has been the unacknowledged shadow that intersects with more prominent approaches such as gender or post-colonialism. A similar lack of interdisciplinary connections has also been the case in gerontology, meaning that the humanities, including literature, found themselves marginalized in this area. However,

this is changing and a genuinely dialogic relationship between literature and gerontology is becoming established, a field appropriately coined by the term 'literary gerontology'. (53)

The 1970s witnessed a huge shift in the domain of knowledge production: the marginal areas were now explored for the study of the issues of the people that remained 'yet uncovered.' Edward F. Ansello concludes in the 1970s that "It would seem that our analysis of old age and literature provides some support for the position that cultural stereotypes regarding growing older, biases with considerable history, continue to be reflected in the printed word" (217). The literary critics now began to examine the creative texts as the source of data to reflect on the nature of biases and cultural worldviews about elderly people. The cultural stereotypes that shaped the understanding and perceptions of the people about age, aging, and the elderly people became the key subject matters of the study.

The critics who were interested in studying the identity of the people also treated literature as the source of data to examine and understand the issues of the elderly population. For them, literature functioned as the window to the social circumstances that surrounded the lives of the old age people. As Martin Kohn, Carol Donley, and Delese Wear critically remark, "Literature can help us understand some of the problems of aging and identity by placing using the perspectives of the elderly persons experiencing the ambiguities of self and in the perspectives of friends and family of that person" (4). When the critics seek the issues related to identity in literary writings, they can observe the formation of self of any class, group, or age. The inner composition of self of the characters organically manifests in creative writings: often, the unspeakable truths of human life also find their creative outlet. Careful readings unearth such facts and let the world stand visibly. Emphasizing the need to understand the issues of the elderly people through literature, Falcus concludes that literary gerontology posits the critic to unearth the intimate observations of the elderly population as reflected in/through creative pieces of writing (58). Both the issues of identity and the margin emerge with prominence in the study of age, aging, and elderly people in literature.

Viewed globally, critics have read literary writings to examine the issues of elderly people. The use of elderly people serves a particular purpose of the authors. Stereotypically, such people are depicted to show death, decay, fear, and loss in literary

writings. For instance, Chris Gilleard analyzes the use of old age in Samuel Beckett's plays and novels. The modern condition of failure is symbolically presented through old age in his literary works. As he argues, "While aging and old age are as present as ever in his later work, agedness seems to be represented differently, more symbolically than functionally. This can be seen, for example, in the monochromatic contrast of white, grey, and black dress or hair, rather than in the display of somatic impairments or complaints" (49). The negative portrayal of aging helps us understand the general perception of aging.

Anne M. Wyatt-Brown also agrees that the world of fiction helps in the exploration of the attitude of society towards elderly people, highlighting the ways society generally treats them. As the character's inner self is modeled after the living people of the society, reading literary texts can enhance the sensitivity of the people about the issues raised therein (125). Both Gilleard and Wyat-Brown agree on the study of the creative pieces to examine the political message embedded therein: they explore the perceptions and perspectives of the people about aging in literature.

However, the Nepali literary landscape presents a quite different picture from that of the global one. Keshab Sigdel's study points at the dismal picture of the national scene as he analyzes that the study of aging has gained prominence in the West as societies have advanced in material transformation and ignored alarming concerns of human life like death. He observes:

Different examples are available in literary narratives to substantiate this idea. While discussing the concepts of aging in American novels, Maricel Oró-Piqueras quotes sociologist Norbert Elias who claims that "aging" and "old age" have become frightening, almost taboo terms in Western society because death is increasingly invisible in advanced societies. (107)

Western societies have identified the need to look into the issues of elderly people and the perceptions shaping general attitudes towards them; consequently, they have started treating creative writing as the source of data to conduct serious studies on age, aging, and elderly people. Such studies also help the government agency formulate and implement intervention programs at the national and sub-national levels. Yet, another study by Hom Nath Chalise points out that only a scanty amount of research has been conducted on the issues of the elderly population in Nepal as he writes, "Now, the

provincial government should promote to carry out some local-level research and their findings should be incorporated in the policy formulation. It will help to promote the quality of life of the elderly" (11). Sigdel and Chalise agree that properly researching the cause of elderly people can help the government in particular and the society at large. The goal of public welfare is implied in their discussion on the issue of scholarship on aging.

Departure

Contemporary scholarship emphasizes the issues of identity, gender and sexuality, war and conflict, trauma, and the like as short fictions are approached for serious critical study. However, the issues of people from the elderly population have not been able to draw serious attention to the critical study of Nepali short fiction. This study examines the life and the situation of the people abandoned in their houses by their children who go and settle abroad for a better life. The elderly people suffer heavily as the younger people are not with them. This study departs from the prevailing studies in that it focuses on age, aging, and elderly people as they appear in the creative imaginations of contemporary Nepali short fiction.

Waiting for the Unknown: Elderly People at the Margin

Contemporary Nepali short fiction has presented the narratives of elderly people abandoned at the corners of their own families. Aging has never turned into a positive experience for these people: they feel rejected in old age. Mandira Madhushree's "Ambako Bot" [The Guava Tree] (2017), Neelam Karki's "Parkhai" [The Wait] (2019), and Bina Theeng's "Aayam" [A Dimension] (2020) present the people abandoned at their old age in Nepali society: they lead a solitary life in the most critical phase of their life, waiting for their children to come back and support them. The unknown future unfolds into the present just to perplex them further in that they get no solace from their life. The bleakness of the present torments them as much as their experience of aging does to them. This section analyzes the three stories to examine the general context and the problems of age as they emerge in the life of the aging population in Nepal.

Contemporary Nepali society fails to see the elderly people as the repository of knowledge. As a reflection on the course of present development in society, Nepali short fiction spotlights the plight of elderly people. The national boundaries have

become inadequate for people to find happiness in the twenty-first century. The young people go abroad in search of opportunities and luxury of life. For instance, Neelam Karki's "Parkhai" [The Wait] tells the story of a lonely father who waits for his son to return home. Writing the fate of modern Shrawan Kumar, Karki meticulously shows the emotional state of the father on the one hand and the psychological fragmentation that the son has to undergo in the US on the other. The son Shrawan Kumar and his father Dinanath undergo in the modern context of the world. As an immigrant in the US, Shrawan Kumar finds himself trapped among the multiple complexities of modern life. He wants to listen to both his wife Raksha and his father Dinanath. However, modern Shrawan Kumar leaves the elderly father alone in Nepal (197). The long wait never comes to an end for both the father and the son. Karki presents Dinannath's letter to her son in the story as she writes, "After your departure to the US, we have not celebrated any Dashain here at home; still, we pretend to celebrate it for the sake of the society. We had pretended well" (197). The festivals have no meaning for the old parents waiting back at home in Nepal, while the children settle in the first world.

Karki portrays the lonely father waiting for his son to return home and take care of him in his old days. The son fails in his duties: he has struggled throughout his life to settle in the US by obtaining a permanent resident (PR) visa. The old father has not been able to enjoy the festivals in the absence of his son. A similar sort of problem has troubled the protagonist in Mandira Madhushree's "Ambako Bot" [The Guava Tree]. The father waits for the sons to join him at Dashain. He remembers how he planted and took care of the guava trees when he came to the village. The quest of the father tells the story of his struggle to help the sons know their land. However, the sons invent their excuse that each of them will not be able to accompany the father at Dashain. The orphaned father says:

I gave my sons the modern education of my time. My sons who were educated in the city did not want to stay in Nepal for their higher studies. They could not remain aloof from the fashion. They moved to the US as they thought they wouldn't be able to spend a good life with an education in Nepal. We are the parents who were orphaned. Their mother couldn't tolerate the loss of the family. She lost her mind in the absence of the sons. And finally, she left me alone. I was completely an orphan. (185-186)

The suffering elderly population is the contemporary reality of the nation that is reflected

through the creative pieces of short fiction. They wait endlessly for the mercy of the kids. However, the children can never return home to give them any solace. The sons inform the father that they have found their ways of living their life away from the country. The father rears the guava tree, hoping that his sons will come to enjoy the fruit one day. The sons do not understand the expectations and hopes of the elderly father. They tell him why they cannot come home to celebrate the Dashain with him.

After the political change in 2006, Nepal saw unexpected growth in the pattern of youth migration to the first world. Karki and Madhushree's protagonists are created against this backdrop. The early days were well spent as the parents were also young: they could carry out the daily activities on their own. As they grew old, the trouble began in their life. Karki's helpless old man who lives a completely neglected life in his country dies in the end. He cannot do anything except wait for his son. Ironically, the son also fails to do anything except wait for the father to meet with an end. Death solves their problem. In Madhushree's story, the father emerges as resisting one in the beginning: he concludes that his sons have forsaken him. So, he attacks the guava plant that he has taken care of throughout his life. In the end, the regeneration indicates that he forgives them. A similar type of uncomplaining retired medical professionals appears in Bina Theeng's "Aayam" [A Dimension]. Their children are also settled abroad. However, Theeng does not fully develop their character in the story.

Karki's modern Shrawan Kumar in "Parkhai" fails to serve his father at the end of his life. Dinanath is living a solitary life in the absence of his son: after his wife passes away, he has no company to live with (198). The author shows the life of elderly people without any young members in the family. Dinanath suffers because he does not have anybody to depend on. On the other hand, Neelam Karki's Shrawan Kumar cannot decide to come back to Nepal: he is thinking a lot. As Karki narrates,

> "Shrawan, have you booked the tickets?" Manohar asks.
>
> His wife Raksha looks at him, amazed.

"Have you really decided to go? Are you going, to quit everything when you are almost about to settle on everything? Aunt Sulochana says.

"One must go. What the hell can a son do to a father if he does not do anything in such a situation?" It is the voice of intoxicated Tika. (206)

Even though Shrawan Kumar feels more connected to his father, he cannot make any decision to just leave the country: he has been waiting for a permanent resident (PR) visa in the US. Trapped in the uneven circumstances of modern life, Shrawan Kumar turns into a very complex man who fails to choose between duty and modern life. On the other hand, Madhushree's protagonist suffers in isolation, talks to his children over the internet, and waits for them to come and enjoy guava at Dashain. When he gets to know that the sons are not coming home at Dashain (188), he gets furious at them. He chops down the tree. Symbolically, the tree represents his children. Mandira Madhushree cannot give it a cruel ending as she writes, "After a few days, there were new leaves springing from the studs of the guava tree" (190). In both cases, the fathers cannot meet the sons. Karki's Shrawan Kumar cannot even attend his father's funeral.

The conceptualization of elderly people has significantly changed in the time between Shrawan Kumar and his father Dinanath: the son cannot cherish his father's old age, while his father Dinanath mended the boots and jacket as a matter of protection. Elderly people gave comfort and protection in the past. Dinanath loves his father's jacket and boots: his father was an ex-soldier in the Indian Army (202). At present, the youths have started to take them as a burden. The elderly people become a burden to the youths and the society. Though Shrawan's wife, Raksha can also feel the pain of the elderly people, she finds herself helpless to take any action to help them. Raksha says:

"We cannot do anything staying with them [the old father] back at home. We have fulfilled our duty. We have brought them to a luxury house in the city, away from their search for grass or wood in the forest every day. We are not yet settled here. We have provided for good clothes and food. We have paid the medical bills. If we had not come here, your father would have passed away some five to ten years ago. Don't you see it? We have given him an additional life." (207)

The son stays in the US, undecided, while the father peacefully passes away one day. There appears a spiritual rift between duty and the prevailing circumstances in the lives of modern people, resulting in complications in the lives of elderly people in general. The helplessness of the modern youth has turned the experience of elderly people into a very frustrating part of their lives. Elderly people undergo huge psychological pressure and they cannot experience positive emotions like love, pity, kindness, and peace in modern times. Bina Theeng's "Aayam" [A Dimension] depicts a woman in her early

fifties as an old person. She has lost her hope: her only son, Kamal dies in a bike accident. As a liberal woman, she encourages her daughter-in-law to get married to Suraj. However, she also seeks the support of the younger people in her later life.

Viewed from the other way around, Karki and Madhushree rewrite the story of modern Shrawan Kumar. To them, the sense of duty makes no sense at all: they know that life requires material gain, transformation, and luxury. They enjoy the fruits of modern life, away from their society and family. Bina Theeng talks of another widow who works as a domestic helper in a retired doctor's house. The old couple's children are settled abroad. Yangji sends a widow, Santamaya to work in the house of a retired doctor. They are old and Bina Theeng describes their life thus:

After a week Santamaya started working. The house for which she worked was that of a retired doctor couple. Only the couple lived in the house. Both the sons were abroad. The house had a wide compound, a garden, and a two-and-a-half-storied house. The couple had difficulty managing the house. They needed hands to work in the garden. They needed steps to go across the kitchen, bathroom, lawn, and balcony. (75)

The retired medical professionals join an endless queue of the people whom we find in Karki or Madhushree's stories. Though Theeng does not further explore the life of the couple, we get to see the life they are spending in their old age. Without Santamaya, they cannot support themselves. They cannot move about in the house in the absence of their domestic helper and driver. The author never talks of their sons living abroad.

Conclusion

The contemporary Nepali short fictions depict the situation in which the people suffer in their old age. Karki's old man swiftly dies. Madhushree's old man sublimates his anger by felling the guava tree; still, he has to continue to lead an unhappy and solitary life. Theeng's professional doctors do not emerge in the full stature of the story as the author explores a different dimension of social life through the story. All these cases imply that aging has emerged as an issue requiring critical attention in society and people have not been able to positively experience old age. The complexities of old age and the experience of the elderly population have been greatly affected by the age of migration in Nepal. Karki, Madhushree, and Theeng approach aging, placing the experience of aging from the perspectives of the elderly people abandoned back at home to patiently

wait for their 'happy ending' (?) in the absence of their 'busy' children.

Acknowledgments

I acknowledge that this research article has been developed from the larger research project titled "Representation of the Issues of Elderly People in Contemporary Nepali Short Stories" (UGC Award No: SRDIG-77/78-H & S-06) conducted with financial support from University Grants Commissions, Nepal. I express my gratitude to the Commission for the generous support during the research.

Works Cited

Ansello, Edward F. "Old Age and Literature: An Overview." *Educational Gerontology: An International Quarterly,* vol. 2, 1977, pp. 211-218.

Barnum, Phyllis Winet. "Discrimination against the Aged in Young Children's Literature." *The Elementary School Journal,* vol. 77, no. 4, March 1977, pp. 300-306.

Chalise, Hom Nath. "Provincial Situation of Elderly Population in Nepal." *American Journal of Aging Science and Research,* vol. 1, no. 1, 2020, pp. 9-11.

Elder, Glen H., Jr. "Time, Human Agency, and Social Change: Perspective on the Life Course." *Social Psychology Quarterly*, vol. 57, no. 1, March 1994, pp. 4-15.

Falcus, Sarah. "Literature and Ageing." *Routledge Handbook of Cultural Gerontology,* edited by Julia Twigg and Wendy Martin, Routledge, 2015, Pp. 53-60.

Gillis, Candida. "English Education and Aging." *The English Journal,* vol. 72, no. 5, September 1983, pp. 62-66.

Karki, Neelam. "Parkhai"[The Wait]. *43 Katha* [43 Stories]. Sangrila, 2019, pp.197-211.

Kohn, Martin, Carol Donley, and Delese Wear. Introduction. *Literature and Aging: An Anthology,* edited by Martin Kohn, Carol Donley, and Delese Wear, Kent State University Press, 1992, pp. 3-4.

Madhushree, Mandira. "Ambako Bot" [Th Guava Tree]. *Budhanko Ghodi*, Dambarkumari Ganesh Sahitya Pratishtan, 2017, pp. 180-190.

Sgarbieri, Valdemiro, and Maria Teresa Bertoldo Pacheco. "Healthy Human Aging: Intrinsic and Environmental Factors." *Brazilian Journal of Food Technology*, vol. 20, 2017, pp. 1-23.

Sigdel, Keshab. "Conceptualizing of Aging Literature: A Global Perspective." *The Outlook: Journal of English Studies,* vol. 12, July 2021, pp. 104-109.

Theeng, Bina. "Aayam" [A Dimension]. *Yambunera*, Phoenix Books, 2020, pp. 70-80.

Wyatt-Brown, Anne M. "Enlarging the World." *Generations: Journal of the American Society on Aging,* vol. 41, no. 4, Winter 2017-2018, pp. 124-129.

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2023v5i2eg3
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -V, Issue-II, December 2023
Pp. 81-91

Exploring Domestic Violence and Child Abuse in Select Novels of Toni Morrison

Roxana Khanom

Roxana Khanom
Associate Professor
Department of English
Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh
e-mail: roxanarahmanshipu@gmail.com

Abstract

Violence against African American females, young and old, is an irresistible concern in the novels of Toni Morrison. Her best fictional pieces, 'The Bluest Eye', 'Beloved', and 'God Help the Child' are the vibrant spotlight of domestic violence and child abuse in variegated natures. Toni Morrison has dealt profusely with all sorts of child maltreatment in her oeuvre.

In many of her narratives, Morrison weaves a tangled web of childhood trauma stories, in which all the characters have suffered some kind of abuse like racial discrimination, neglect, witnessing domestic violence, emotional and psychological abuse, molestation, sexual exploitation, verbal abuse, etc. She shows how the child's exposure to traumatic experiences has far-reaching negative effects on adulthood, such as psychological, emotional, behavioral, and social. Morrison explores the curse of the past, the legacy of slavery and its aftermath, and its hold on the present, through the sociocultural phenomenon. Racism and intra-racial discrimination based on skin color result in childhood trauma. The sexual abuse of Pecola, the girl desiring the bluest eye by her drunken father has been very vividly picturized in the backdrop of racial conflict in 'The Bluest Eye'. Morrison's 'Beloved' fictionized the gruesome murder of an infant with a jigsaw by her mother, Sethe only to avoid escaping a slave. God Help the Child chronicled the ramifications of child abuse and neglect through the tale of Bride, a black girl with dark skin being born to light-skinned parents. Moreover, magic realism, socio-political aspects, and Toni Morrison's lucid narratives provide ultra energy promoting her vivid message.

Keywords

Domestic violence, Child abuse, Magic realism, Childhood trauma, Racism, Discrimination, Exploration

Objectives of the Study

This study aims to comprehensively explore the portrayal of domestic violence and child abuse in specific novels by Toni Morrison, including *The Bluest Eye, Beloved*, and *God Help the Child*. It seeks to delve into the profound effects of these traumatic experiences on the personalities and identities of the victims. Additionally, the study endeavors to raise awareness and cultivate empathy by conducting a focused analysis of Morrison's literary works. By doing so, it aspires to make a valuable contribution to the ongoing scholarly conversation surrounding the critical issues of domestic violence and child abuse.

Literature Review

An extensive study from different sources like published books, theses, journals, web pages, blogs, etc. has been undertaken for the smooth conduct of the research. There is no direct way to walk upon and no shortcut answer to decide about *Exploring Domestic Violence and Child Abuse in Select Novels of Toni Morrison*. However, the following resources are reviewed eliciting material for this study:

Domestic Violence towards Women Characters as Seen in Toni Morrison's The Bluest Eye by Ichwati Yuliana, Fabiola Dharmawanti Kurnia, Ali Mustofa has researched Domestic Violence towards Women Characters as Seen in Toni Morrison's *The Bluest Eye* and specified some issues that can illuminate my work. Another research has been commenced titled *Beyond Subjective Violence: A Zizekian Reading Of Toni Morison's Beloved* by Fazel Asadi Amjad, Najlaa Atshan Kalaf Al musawi of Kharazmi University, Iran. It has been published in the Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17(5), 1254-1261. ISSN 1567-214x. The study too shows different types of violence in Beloved. Research has been made on a modern feminist standpoint titled, Objectification Theory: The Themes of Violence and Diverse Sexualities in Beloved and The Bluest Eye of Toni Morrison by Dr J.P Aggarwal & Ms. Vinisha Sharma. Some very crucial observations have been focused on modern feminists such as Julia Kristeva, Luce Irigary and Irigary have expressed their opinions on the negative impact of objectification of the female

body. Morrison wrote her novels to depict the themes of the sexual oppression of women and their marginalization. All her women characters, Sethe, Pecola, and Denver are trapped in a situation leading them to dehumanization and degradation. A research work on Domestic Violence in Toni Morrison's *God Help the Child* by Dr. S. Horizan Prasanna Kumar is conducted and published on Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 18:3 March 2018 Dr. T. Deivasigamani, Editor: Vol. II Black Writings: A Subaltern Perspective Annamalai University, Tamilnadu, India. This study shows *God Help the Child* from different angles of violence and childhood scars.

Methodology of the Study

The research *Exploring Domestic Violence and Child Abuse in Select Novels of Toni Morrison* employed a qualitative design, utilizing textual analysis to critically examination on how Toni Morrison portrays domestic violence and child abuse in selected novels, namely *The Bluest Eye, Beloved, and God Help the Child.* These novels were chosen for their thematic exploration of research issues. Related data was gathered through a meticulous reading process, capturing relevant passages, character descriptions, and instances of domestic violence and child abuse. Some additional data was collected from various sources such as web pages, blogs, and social networking sites. The study was guided by theoretical frameworks, including Feminist Theory, Trauma Theory, Psychoanalytic Theory, and Critical Race Theory, offering lenses to comprehend the sociocultural, gendered, and racial dimensions within Morrison's works.

Introduction

The portrayal of domestic violence and child abuse is a recurring and deeply impactful theme in the literary works of Toni Morrison. Domestic violence occurs as a pattern of abusive and coercive behaviors. It concerns physical, sexual, and mental assault, as well as economic coercion that adults use against their intimate partners (Schecter & Ganley, 1995:16). Morrison's poignant narratives delve into the complexities of human relationships, exposing the painful realities of violence within the domestic sphere and the lasting scars it leaves on individuals, families, and communities. Morrison became blessed to be the first African woman to receive the Nobel Prize in Literature in 1993.

Morrison's exploration of domestic violence and child abuse is deeply rooted in her commitment to giving voice to marginalized individuals and communities. Her characters are often confronted with the harsh realities of violence, whether it be physical, emotional, or psychological, and their struggles to navigate these traumatic experiences form the core of her narratives. This critical analysis aims to delve into the portrayal of domestic violence and child abuse in Morrison's works, focusing on selected novels such as *The Bluest Eye, Beloved,* and *God Help the Child.* With a breakthrough exploration of Morrison's portrayal of domestic violence and child abuse, this paper recognizes the sensitivity of the subject matter and the importance of approaching it with empathy, respect, and a commitment to amplifying marginalized voices.

Analysis and Interpretation

Toni Morrison, in many of her fictions, paints her concerns about child abuse, domestic violence, and many unhealthy traumatic situations. Outlining the roots of this violence to the days of slavery that justified the inhuman treatment of blacks by their white masters, black women are seen to be the nastiest sufferers as they have been doubly oppressed because of their race and gender. Black female children face abuse in their own homes as well as from their community. Domestic violence in African American families can be traced back to the days of slavery and the inhuman treatment blacks received from their white masters. For both black males and females, slavery was a devastating experience. And yet, black women were doubly oppressed because of their race and gender, especially dramatic is the abuse black female children faced inside and outside their home.

Silent Trauma Echoes in *The Bluest Eye*

Violence of any sort can lead to the physical and mental collapse of a child. In some societies, women were traditionally considered the man's asset; he had the power to control and punish them and the children physically for instance beatings (Summers, 2001). Toni Morrison has shown the practical field of this theory in *The Bluest Eye*. Pecola Breedlove has to face a lot of turbulence due to this unhealthy family relationship; she has to pay with her life.

The Bluest Eye by Toni Morrison is a powerful and thought-provoking novel that delves into themes of beauty, identity, child abuse, domestic violence, and the devastating

effects of racial self-hatred. Set in the 1940s in Lorain, Ohio, the story follows the life of Pecola Breedlove, a young African-American girl who longs for blue eyes and believes that possessing white skin and a pair of blue eyes would make her beautiful and valued in a world that idolizes whiteness.

Pecola grows up in a troubled household, experiencing neglect and abuse from her parents, Cholly and Pauline, who are victims of their own personal traumas and societal pressures. She finds solace in her friendship with Claudia MacTeer, a young girl who narrates parts of the story. As the narrative unfolds, Morrison explores the destructive impact of white standards of beauty on Pecola's self-esteem and mental well-being. Pecola's desire for blue eyes symbolizes her longing for social acceptance and her belief that conforming to white ideals would bring her happiness and escape from her painful reality.

Morrison also incorporates the perspectives of other characters, such as Soaphead Church and Geraldine, who exemplify the damaging effects of internalized racism and the perpetuation of oppressive beauty standards within the African-American community. Their narratives further emphasize the complexity of racial identity and the corrosive nature of societal prejudices. Being scorned in her daily life makes Pecola become silent, loveless, lost self-esteem, and unconfident girl. She grew up in a traumatic life. When she is at school, she cannot resist being ridiculed by her friends and teachers about the color of her skin.

"Her teachers had always treated her this way. They tried never to glance at her and called on her only when everyone was required to respond (Morrison, 1970:46-47)

She is harassed by her schoolmate and her teacher for being black and ugly. She receives verbal assault from her peers who humiliate her since she has having unattractive physical appearance.

"Bobby loves Pecola Breedlove! Bobby loves Pecola Breedlove!" and never fails to get peals of laughter from those in earshot, and mock anger from the accused." (Morrison, 1970: 46)

Moreover, she is not only harassed by the white kids but also by her own race. Every day is miserable for Pecola. They bully her verbally by calling her 'black e mo' (Morrison,

1970: 62). Facing verbal bullying shatters her psychology. Pecola, too endures physical violence from her mother.

"Mrs. Breedlove yanked her up by the arm, slapped her again, and in a voice thin with anger, abused Pecola directly…" (Morrison, 1970: 85)

Violence becomes prominent in Pecola's life. Almost every day, she accepts bad behavior and attitudes. Her parents become the perpetrators of the physical assault. Tragically, Pecola's yearning for blue eyes intensifies to the point of madness, and she becomes pregnant after a horrifying incident of sexual abuse by her father. The community, instead of offering support and understanding, largely dismisses her suffering, deepening her isolation and despair.

Through *The Bluest Eye*, Toni Morrison raises important questions about the nature of beauty, the damaging consequences of racism, and the enduring legacy of exploitation. The novel challenges readers to confront the sad plight of a teenage girl who becomes the victim of incest, and severe ill-treatment, and ultimately dies a premature death. Morrison's work exposes the destructive power of internalized racism and serves as a poignant reminder of the importance of embracing one's unique identity.

Racial Aggression and Juvenile Mistreatment in Toni Morrison's Beloved

Toni Morrison's *Beloved* explores the brutal experiences of slavery and their lingering effects on the characters. Set in the post-Civil War era, the story revolves around the character of Sethe, a former slave who escaped from a plantation called Sweet Home in Kentucky to Ohio. The novel is loosely based on the true story of Margaret Garner, an enslaved woman who escaped with her children and killed her infant daughter to prevent her from being captured.

The character of Sethe, a former slave, is haunted by the traumatic events of her past. Sethe's life is marked by extreme violence and abuse, both at the hands of slave owners and within her own community. In *Beloved,* Morrison, *"unconstrained by nineteenth-century mores, . . . breaks open the taboo on speaking openly about sexuality and sexual abuse*" (Montgomery 55). Many characters in the novel experience traumas because of their past, which was filled with sexual assaults.

Sethe, the main character, is lucky to have the same father for all her four children. Yet, during her enslaved time at the Sweet Home, she faced a brutal assault, which

affected her as a mother. The physical abuse she went through symbolizes the hardships that slave mothers had to go through because the men, as she states, "took my milk" (Morrison 17). She was deprived of one thing that connected her to her children – her milk:

"They used cowhide on you?"
"And they took my milk!"
"They beat you and you was pregnant?"
"And they took my milk!" (Morrison 20)

Sethe did not care about the fact that they beat her, she only cared about her milk, which was meant for her children. On the one hand, this shows her love for her children and the fact that they were of the utmost importance to her. On the other, she represents all enslaved mothers who struggled and were in enormous pain because they could not raise or nurse their children properly. Sethe would do anything to protect her children and her murder of Beloved proves that. In addition, she would do anything for her children, even selling her own body, i.e. this is how she manages to engrave Beloved's tombstone.

Baby Suggs, too was raped several times and had different men father her eight children. This affects her life greatly as she struggles to connect emotionally with her children. The only child of hers whom she saw become an adult is Halle, Sethe's husband. Just like other black women, she was exploited by men, both black and white. Most children were taken away from their slave mothers after they were born, but Baby Suggs was lucky to manage to keep at least one of her children with her, that being Halle: *"And He did, and He did, and He did and then gave her Halle who gave her freedom when it didn't mean a thing"* (Morrison 23).

Another character who went through this despicable act is Ella, who does not want to nurse her child because it was conceived through rape and, consequently, the child dies. These are only some of the examples of how slavery sexualized and sexually abused women. White men had absolute power over enslaved people, and they could do whatever they wished to them, without facing consequences, which left many women with unforgettable traumas.

Slavery dehumanized Sethe's mother so much that she discarded all her children except Sethe: *"She threw them all away but you. The one from the crew she threw away on the island. . . . Without names, she threw them. You she gave the name of the black man"* (Morrison 62). This situation describes the level of pain women felt when raped: Sethe's mother got rid of her children because they reminded her of her rapist(s). Moreover, the usage of the word "threw" shows and emphasizes the lack of love Sethe's mother had for her other children. There was no connection between them. She only kept Sethe because she loved her father and her death might have been a way in which she wanted to protect her daughter.

The ghost of Sethe's deceased daughter, known as Beloved, appears later in the story. Beloved's presence represents the haunting legacy of slavery and the unresolved trauma that continues to shape the lives of the characters. Beloved's arrival causes a further exploration of the devastating effects of violence, both physical and emotional, within the community.

Sethe's act of killing her own children is an extreme portrayal of the devastating impact of slavery on an individual's psyche. Sethe's motivation for committing infanticide is driven by her belief that death is a preferable fate for her children than a life of slavery and the horrors they would inevitably face. In her own distorted logic, she sees the act as an act of love and protection, attempting to shield her children from the brutality and dehumanization of slavery.

Through richly layered storytelling and poetic prose, Toni Morrison's *Beloved* delves into the depths of human resilience and the complexities of freedom and redemption. *Beloved* serves as a powerful exploration of domestic violence and child abuse within the context of slavery. Through her poignant narrative style, Morrison calls for empathy and understanding in addressing the deep wounds of violence.

Family Strife and Child Maltreatment in Toni Morrison's *God Help the Child*

In Toni Morrison's novel *God Help the Child,* the themes of domestic violence and child abuse are explored, though in a more subtle and nuanced manner compared to some of her other works. The novel delves into the complex dynamics of family relationships, the impact of childhood trauma, and the search for identity and self-worth.

The character Bride, a young woman with deep skin and blue-black hair, experiences emotional abuse from her mother, Sweetness, throughout her life. Sweetness, who struggles with internalized racism and a belief in colorism, rejects and mistreats her daughter because of her dark skin. Bride's mother's rejection and emotional abuse profoundly affect her self-esteem and her understanding of love and relationships.

"It's not my fault. So you can't blame me. I didn't do it and have no idea how it happened ... She was so black she scared me. Midnight black, Sudanese black. I'm light-skinned, with good hair, what we call high yellow, and so is Lula Ann's father. Ain't nobody in my family anywhere near that color. Tar is the closest I can think of." (Morrison, Part 1, Chapter 1, Page 3)-- Sweetness's disavowal of all responsibility for her mistreatment of her daughter is a classic example of child abuse verbally and emotionally.

While physical violence is not as prominently depicted in the novel, there are instances of child abuse that are referenced in the narrative. For example, Bride's childhood friend, Booker, carries the trauma of physical abuse inflicted upon him by his father. His experiences shaped his adulthood and his difficulties in forming healthy relationships.

God Help the Child highlights the long-lasting scars left by emotional abuse and childhood trauma. One of the important prominent matters in *God Help the Child* is the childhood dilemma and how it impacts its victim during adulthood. Bride, the root of her childhood dilemma lies with how she was used to sweetness. At first, she called herself as a Bride, but she was Lula Ann and was subjected to a childhood filled with disgust and neglect. She was fully affected by physical abuse and Lula Ann was denied consciousness and physical affection. Sweetness raised

Lula Ann is at a gap, not accepting her to grow close to her. Lula Ann compels her to navigate girlhood in a sexist earth with a mother who not only avoids her daughter but also strengthens misogynistic stigmas.

Significant memories in Lula Ann's life and girlhood development become the sources of hard memories. She has denied intimacy with her mom due to her color. *"I told her to call me 'sweetness' instead of 'Mother' or Mama'.*

It was safer. Being that black and having what I thought were too-thick lips calling me 'Mama'

would confuse people" [Morrison,6].

She was denied even referring to her mom as such due to her color. Lula Ann and many such black children were made compulsory to grow mature quicker than other children solely because of their skin color. They have many risks and expectations to follow as black children.

Lula Ann taught rules to remove falling victim to racism. Sweetness point of view Lula Ann's dark black color is a curse.

God Help the Child parades substantial hopefulness. There is no doubt that the psychological and emotional childhood scars that inhabit this narrative are somehow finally fixed. Most of the main characters, true survivors of child abuse, experience a purifying transformation in their lives. Rain finds in the hippy couple the possibility of growing up and healing from her childhood wounds. All the characters of Morrison one way or another, carry the burden of childhood pain: *"A set of connections, which extend from her [Bride] to Booker and on to a semi-feral girl named Rain . . .: a cycle of abuse, of molestation"* (Ulin, 2015). Morrison *"carefully explores the nature of victimhood and the consequences of domestic violence through a series of fascinating and believable narrators."* (Iqbal, 2015)

Conclusion:

Through a deep examination of Morrison's key novels, *The Bluest Eye*, *Beloved*, and *God Help the Child*, this research article has unmistakably emphasized that Toni Morrison's literary contributions extend far beyond storytelling. Morrison confronts readers with uncomfortable realities through her unique depiction of Cholly Breedlove, Sethe, and Bride, who endure various forms of abuse. Morrison's powerful prose narratives compel us to engage with the deep-rooted scars left by domestic violence and child abuse and to acknowledge the urgent need for healing and social change. Through her nuanced characterizations, Toni Morrison has underscored the power of literature to illuminate social injustices and inspire transformative conversations. Her fiction serves as a cautionary signal calling for immediate action, urging readers to recognize the impact of violence and work towards a future where every individual, especially the most vulnerable, can live free from abuse.

Works Cited

Barclay, Jennifer L. *Mothering the 'Useless': Black Motherhood, Disability, and Slavery.* Women, Gender, and Families of Color, vol. 2, no. 2, 2014, pp. 115-140. JSTOR, www.jstor.org/stable/10.5406/womgenfamcol.2.2.0115. Accessed 20 June 2020.

Beaulieu, Elizabeth A. *The Toni Morrison Encyclopedia*. Greenwood Press, 2003.

Bourne, Jenny. *Slavery in the United States." Encyclopedia of Law and Economics*, 2014. Research Gate, https://www.researchgate.net/publication/304140187_Slavery. Accessed 5 Aug. 2020.

Cowling, Camillia, et al. *Mothering Slaves: Comparative Perspectives on Motherhood, Childlessness, and the Care of Children in Atlantic Slave Societies.* Slavery & Abolition, vol. 38, no. 2, 2017, pp. 223-231. Taylor and Francis Group, https://doi.org/10.1080/014403 9X.2017.1316959. Accessed 23 June 2020.

Jennings, Thelma. *Us Colored Women Had to Go Through A Plenty': Sexual Exploitation of African-American Slave Women.* Journal of Women's History, vol. 1, no. 3, 1990, pp. 45-74. Project Muse, https://doi.org/10.1353/jowh.2010.0050. Accessed 17 June 2020.

Jesser, Nancy. *Violence, Home, and Community in Toni Morrison's Beloved*. African American Review, vol. 33, no. 2, 1999, pp. 325-345. JSTOR, https://www.jstor.org/stable/2901282?seq=1. Accessed 15 June 2020.

Lopez Ramirez, Manuela. *What you do to Children Matters': Motherhood in Toni Morrison's God Help the Child.* The Grove: Working Papers on English Studies, no. 22, 2015, pp. 107-119. https://doi.org/10.17561/grove.v0i22.2700. Accessed 15 June 2020.

Montgomery, Maxine L. Contested Boundaries: *New Critical Essays on the Fiction of Toni Morrison.* Cambridge Scholars Publishing, 2013.

Mock, Michele. *Spitting out the Seed: Ownership of Mother, Child, Breasts, Milk, and Voice in Toni Morrison's Beloved.* College Literature, vol. 23, no. 3, 1996, pp. 117-126. JSTOR, https://www.jstor.org/stable/25112278?seq=1. Accessed 16 June 2020.

O'Reilly, Andrea. *Toni Morrison and Motherhood: A Politics of the Heart*. State University of New York Press, 2004.

Gnanamuttu, Dr. L. Anita, and Afrin, Ms. J. *Toni Morrison's God Help the Child.* RABINDRA BHARATI JOURNAL OF PHILOSOPHY, ISSN: 0973-0087.

Kuma, Dr. S. Horizan Prasanna. *Domestic Violence in Toni Morrison's God Help the Child.* In Dr. T. Deivasigamani, Editor: Vol. II Black Writings: A Subaltern Perspective, 18:3 March 2018, www.languageinindia.com ISSN 1930-2940.

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2023v5i2eg4
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -V, Issue-II, December 2023
Pp. 92-111

Genocide and Ecological Ruin in Amitav Ghosh's *The Nutmeg's Curse: Parables for a Planet in Crisis*

Kamal Sharma

Kamal Sharma
Lecturer
Department of English
Ratna Rajyalaxmi Campus
Kathmandu
e-mail: kamalsharmabaglung@gmail.com

Abstract

Writing against the backdrop of the global pandemic of COVID-19, Amitav Ghosh in his latest non-fiction text The Nutmeg's Curse: Parables for a Planet in Crisis (2021), traces the contemporary planetary crisis back to a historical event popularly known as the Dutch Massacre that occurred in 1621. This massacre resulted in the ruthless exploitation of humans and the natural world by Western imperialism. Ghosh observes that the Banda islands were rich sources of nutmegs and this is the reason why Bandalese was attacked by European settlers to own nutmeg plantations. Dutch officials viewed that there could be no trade without war. The remaining Bandalese who survived the massacre went towards the forests to hide and started living with the spirits of woods, animals, and nature. For Bandalese, nature, as Carolyn Merchant claims, was a mother. The trade and business that the European settlers started along with the genocide of Bandalese continued in different forms and prepared a ground for the ecological crisis. The current predicament is the outcome of a mechanical view of the world in which nature is viewed as a resource for humans to exploit for their purposes. Drawing on the concepts of ecological theorists, this paper claims that the entire relationship of humans to non-human kind such as rivers, mountains, woods, animals, and the spirits of land should be based on reciprocity, ethics, and egalitarian concepts. The transfer of nutmeg from the original islands to the economic centers reveals a wider colonial mindset that justifies the exploitation of the entire ecology, which continues to lead to geopolitics, and functions as a source of planetary crisis. As the paper is qualitative, the ecocritical perspective has been applied to the primary text to conclude that the environmental crisis, seen or unseen, is rooted in colonial practices and capitalism.

Keywords

Banda islands, Ecology, Genocide, Nutmeg, Planetary crisis

Introduction

The Nutmeg's Curse: Parables for a Planet in Crisis (2021) by Amitav Ghosh written against the backdrop of COVID-19, exposes the environmental crisis that Ghosh links to the Banda Islands massacre which I refer to as genocide in my paper. Banda Island lies in the east of Indonesia having an amazing tree that produces both nutmeg and mace. The period of enlightenment led to a way of looking at Earth as a repository of resources made only for human use. It is still in practice as modern society is guided largely by material gain. The genocide was an exposition of the colonial mindset of Dutch settlers who came to Banda islands to have monopoly markets over the nutmegs and mace as these valuable things are found in the islands. Most of the Bandalese were killed as they came to defend their land. However, they could not succeed as they were not fully prepared for war. Talking about nutmeg, mace, and cloves, Ittersum Van asserts, "Nutmeg, mace, and cloves had reached Europe via ports in the Middle East during the Middle Ages. One of the aims of European expansion into Asia was to cut out Muslim middlemen and establish direct trade links with the Spice Islands" (2). Due to the nutmeg, mace, and cloves, the European expansion into Asia was designed. In this process, the Bandalese were the victims who suffered a lot Van further discusses "The Bandalese were the victims of Anglo–Dutch imperial competition in Asia in the period 1609– 1621" (5). They were the victims of imperial competition for nutmeg. Ghosh, through this text, challenges imperial tendency embedded in the activities of Dutch settlers, and critiques war, empire, and genocide supported through the Earth-devouring logics that underpin ecological disaster. Here, I claim that genocide on the Bandalese led to an environmental crisis as the way Bandalese treated nature was different from Dutch settlers' understating of nature.

Review of Literature

The text *The Nutmeg's Curse: Parables for a Planet in Crisis* is the new and latest text of Amitav Ghosh published in 2021 AD. Though the text has not received substantial reviews yet, a few criticisms published in 2022 onwards indicate that the book is remarkable for its form and contents. Jialan Deal discusses the exploration of Western

Colonialism and its ecological Impact. He argues, "In The Nutmeg's Curse, Ghosh theorizes that the objectification, exploitation, and mistreatment of the Earth's resources results from the world order Western colonization created" (127). He means to say that the act of objectification, exploitation, and mistreatment of nature's resources results from the colonizing project of Westernization.

The text talks about how the world gradually lost its organic form as humanity began to think that development is based on the exploitation of nature. The planetary crisis that appears and reappears constantly haunts Ghosh. Ghosh argues that today's climate change dynamics are based on Western colonialism. Then, Deal further talks about the history of the Banda Islands where the source of nutmeg lies— an important economic site for colonizers, "Ghosh then uses a story from the Dutch occupation of Indonesia, specifically in the Banda Archipelago, as a parable for how European colonization has shaped ecological perceptions of the Earth. In the 1600s, the Banda Archipelago had an abundance of trees that produced nutmeg, a valuable spice in European markets" (128). According to the arrival of the Dutch there in the Banda Islands, they began to see the nutmeg as a source of earning huge money. They never thought of the cultural implication of Bandalese's understanding of nature. They treated the land as a resource, "The author's use of nutmeg in this context has both material and immaterial aspects. In the modern-day, nutmeg is often viewed through the lens of its historical value in trading and commerce. In contrast, while the traditional Banda did see the commercial power of nutmeg, they also saw the spice and their natural environment "not as land, but rather as Land" (Deal 129). They viewed, nutmeg— the spice and natural environment 'not as a land of less importance', but rather as a 'Land of tremendous importance'. In the same way, the reviewer— Sujata Byravan in "The Nutmeg's Curse' Review: Listening to Nature's Voice" argues:

Amitav Ghosh opens *The Nutmeg's Curse* with soldiers from the Dutch East India Company unleashing their savagery on the people of the Banda Islands in the 17th century. Bandalese chiefs were mercilessly massacred, and the extermination of the people lasted 18 years, with "not a vestige of their language or peculiar customs" remaining. Ghosh then moves from Indonesia to the heinous crimes of genocide of Native Americans in North America. His polemic links settler colonialism and its barbaric values to the sustained culture of domination and destruction of the land and people. (n. p.)

The review published in *The Hindu* newspaper of India by the reviewer— Sujata Byravan sheds light on how Dutch people came to loot the Banda Islands in the seventeenth century. Bandalese chiefs and locals were mercilessly dominated and massacred for economic purposes. Saswat Samay Das shares her opinion about the text which has both aesthetic and political messages. Das argues, "His narrative creatively engages with archives of colonial history, yet does not stand as a full-fledged transgressive act. At an aesthetic level, his engagement displays a radical shift as he re-narrates the history of colonial exploitation in the form of anecdotes . . . archetypical postcolonial criticism that seeks to capture colonialism as a mesh of eco-exploitative practices" (1). Das suggests that *The Nutmeg's Curse* can be studied in two levels: aesthetic and political. The available reviews indicate that the text is one of the best examples of how colonial force dominated both humans and nature. However, these reviews have not explored this issue in detail and since the book is a recent publication, it has not received much reviews and criticism yet. Thus, I attempt to locate how the genocide that occurred on the Banda Islands led to the planetary crisis.

Methodology

The research design in this paper follows qualitative interpretative methods to analyze data collected from the primary text *The Nutmeg's Curse: Parables for a Planet in Crisis* by applying ecological perspectives countering colonial projects of muting and savagery. The ecological crisis due to the violence in nature has been an important topic in literary scholarship. In a world where human anti-ecological activities have not been checked, it is normal and natural for disasters to fall. Amidst such context, I have chosen the non-fiction text – *The Nutmeg's Curse: Parables for a Planet in Crisis* (2021) by Amitav Ghosh. For the exploration of the research issue, I have used theoretical insights from Ramachandra Guha, Maria Miles, and Carolyn Merchant. Furthermore, I have used Norman Naimark's concept of nature and genocide, Prasenjit Duara's concept of crisis in modern times, and Greta Gaard's Ecological Politics to analyze the content from the primary text.

Trade, Genocide, and Environment

The Banda islands were blessed with nutmeg and mace spices. They are so valuable from the economic perspective that the Dutch people wanted to have a monopoly plantation over the islands. Everyone wanted to go there because of the nutmeg tree. In

medieval Europe, a handful of nutmegs could make a person rich. To obtain them, the European settlers went there using coercion. They understood that there could be no trade without war, "There can be no trade without war" (Ghosh 42). This is the reason why they wanted to have dominion over the nutmeg plantation and Bandalese people.

The Dutch forces burnt everything related to the dwellings of Bandalese and destroyed their remaining boats so that they could go nowhere. Their settlements were also ravished. This event occurred in 1621 when the majority of Bandalese were killed. Ghosh argues, "It is not known for sure how many Bandalese survived the massacre of 1621. Coen was a Dutch governor who imposed colonial authority over the Banda islands and it was all his design to have a monopoly market over the nutmeg by killing whoever came on the way. Coen himself believed that no more than a few hundred fugitives escaped from the Bandas" (41). Out of the total Bandalese, the majority of them were killed, some of them were enslaved and some others died of starvation. Those who survived went to the jungle and neighboring islands, "All the Bandalese were left alive fled to the neighboring islands" (40). It was the resistance they showed while protecting their land and nutmeg. They were also enslaved as they had no other option except to surrender. Phillip Winn also talks about the historical horrible event of 1621 that killed the Bandalese and enslaved the survivors. In "Slavery and cultural creativity in the Banda Islands", he argues, "This followed the final brutal conquest of the islands in 1621 by the quasi-sovereign VOC, which sponsored a major military expedition under Jan Pieterszoon Coen to seize possession of the still extensive areas not yet under its control as a result of earlier conflicts. The expedition succeeded, after decimating the local population and razing their fortified settlements" (367). The mission to conquer Banda islands was succeeded and they decimated the local population. The survivors were easily enslaved. After the victory, the Dutch signed the contract for the provision of slaves, "This trade intensified dramatically after the arrival of Europeans, most notably the Dutch, who signed contracts with local rulers in Maluku in the early seventeenth century for the provision of slaves, as well as acquiring them directly or by proxy" (370). The conquering of Nutmeg extended and reached the point where both the Bandalese and Banda islands were conquered by Dutch people. While reviewing *The Nutmeg Curse: Parables for Planetary Crisis*, the reviewer Ashutosh Kumar Thakur talks about how nutmeg was a target for Europeans:

As the nutmeg made its way across the known world, they became immensely valuable - in 16th century Europe, just a handful could buy a house. It was not long before European traders became conquerors, and the indigenous Bandalese communities - and the islands themselves - would pay a high price for access to this precious commodity. Yet the bloody fate of the Banda islands forewarns of a threat to our present day. (1)

The quote highlights how a handful of nutmeg was so valuable that it could buy a house or ship in medieval Europe. The bloody fate of the Banda Islands due to genocide in the name of having a monopoly on nutmeg plantations forewarns of a threat to our present day and future times.

Thakur further talks about how Europeans came to Banda islands for trade and colonialism, "When the nutmeg was discovered by the rest of the globe, European traders quickly conquered the islands, causing indigenous tribes on the Banda islands to pay exorbitant rates for the product" (1). After the discovery of the nutmeg, European traders quickly conquered the islands, causing indigenous tribes on the Banda islands to pay exorbitant rates for the product and they lost their life and their culture.

The genocide began as the Dutch official Mattijin Sonck was suspicious of Bandalese that they could also attack them with their natural weapons. He heard a faint sound of a lamp falling which he misunderstood as an attack of Bandalese. In this regard, Gosh notes, "To this day nobody exactly knows what transpired in Selamon on that night, in Selamon on that April night, in the year 1621, except that lamp fell to the floor in the building where Martijn Sonck, a Dutch official was billeted" (5). He was sure that the war had just been started and ordered the firing, "He and his panicked counselors snatch up their firearms and begin shooting at random" (7). Firing at random, of course, resulted in genocide.

Amitav Ghosh brings reference to the UN convention to talk about genocide. According to the UN Convention of 1946, genocide means, "acts committed with intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group as such" (41). The Dutch officials who came to Banda islands with the intention of trade destroyed the islanders and their surroundings. Not only did the Dutch systematically depopulate the islands through genocide, but they also tried their best to bring nutmeg cultivation into plantation mode, and for this, they used force through violence. Ghosh further asserts, "As this passage makes clear, colonialism, genocide, and structures of organized

violence were the foundations on which industrial modernity was built" (116). The vital connection between war and trade was of course perfectly understood by early empire builders like Jan Coen who said that there could be no trade without war. Talking about Coen, Joella van Donkersgoed explicates, "One central figure embroiled in the events of 1621 when the monopoly on the trade of nutmeg and mace was established by violence, is Jan Coen" (272). For Coen, the genocide and trade of nutmeg go simultaneously as he established a monopoly on islands through violence.

The connection between genocide and trade is highlighted as Naimark talks about genocide as the destruction of a nation or ethnic group. He states, "By 'genocide' we mean the destruction of a nation or an ethnic group. This new word, coined by the author to denote an old practice in its modern development, is made from the ancient Greek word genos (race, tribe) and the Latin cide (killing), thus corresponding in its formation to such words as tyrannicide, homicide, infanticide" (11-12). By genocide, he means to say that it's all about killing the entire race or tribe. It also involves destroying the nation, and terrifying inhabitants. The colonial mentality of European settlers was responsible for the genocide as the colonial subjects like Bandalese could do nothing except die while protecting the land. Naimark further insists, "The colonial powers were ultimately responsible for genocide, and therefore sometimes this phenomenon is known as colonial genocide. Settler genocide makes more sense here to indicate that armed civilians, organized militias, and possesses, carried out the bulk of the killing" (57). Naimark opines that the colonial mindset intends to kill the innocent native people for their vested interest. Thus, it can also be referred to as colonial genocide where armed civilians and organized militias could go to the extent of depopulating the entire population. Thus, in the book, Ghosh mentions, "The Dutch official Martijn Sonck "seized the best houses for his troops, and he has also sent soldiers swarming over the villages, terrifying the inhabitants" (6). He intends to destroy the whole population so that he can have ownership of the nutmeg plantation, "He has come to Selamon under the orders to destroy the village and expel its inhabitants from this idyllic island, with its lush forests and sparkling blues sea"(6). Selamon is a village in Banda islands with its lush forests and sparkling blue seas. Sonck's intention to destroy the villages means to destroy the villagers as well. The Bandalese were not aware of the massacre that they had to face. Even in the peace, genocide occurs. Naimark states, "Even during periods of peace, the threat of war or the ostensible need to prepare for war can instigate

genocidal situations. War is not a necessary precondition for genocide, and genocide does not necessarily occur during war. Still, genocide is most often associated with wartime intentions, policies, and actions" (25). The quote states that the declared war is not only the precondition for genocide. It occurs when one powerful group like colonial powers intends to kill the native people for their motive. As seen in the Banda islands, the attack from the side of Sonck and his people was beyond expectation for Bandalese.

The reason for the massacre was the economic motive due to nutmeg as I already stated above. Ghosh observes that the Banda islands were rich sources of nutmegs, "In the case of the Banda Islands the gift… the tree that produces both nutmeg and mace" (8). It was not the Dutch who only tried to conquer the islands but the other Europeans like the Portuguese, and Spanish who tried to have domination over the Bandalese, "Yet the Europeans— first the Portuguese and Spanish, and then the Dutch— have for more than a hundred years insistently pursued the goal of establishing a monopoly over the islanders' most important products: nutmeg and mace" (13). Thus, the European settlers tried their best to conquer the land, forests, nutmeg, mace, cloves, and Bandalese without thinking about what happened to nature.

Ghosh critiques the idea of conquering nature without thinking about the Earth as a living entity, "But initially the idea that the Earth is a living entity in which life maintains the conditions for life aroused skepticism and even hostility within the scientific community" (86). The scientific community of the modern age considers nature as a dead thing waiting for humans to give life form to nature. As I discuss how trade and genocide are interlinked, now let me discuss how these concepts can have a direct impact on the environment.

Phillip Winn highlights the collective identity of Bandalese associated with land which they take as sacred one, "The forms of collective representation existing in the Bandas are fundamentally local, they do express an identity linked to place" (73). Their identity, as Winn argues, is linked to place. For them, their land is blessed and it is sacred. Winn discusses Bandas's coming into the interaction with the sacred by appreciating the sense of place that is a core aspect of the Bandalese life world, "In the Bandas and Lonthoir, a significant aspect of this sense involves particular kinds of practices, which can be seen as interactions with the sacred" (73). They interact with the sea, and trees, and appreciate the sense of place which after the Dutch massacre disappeared.

After the genocide, interactions between Bandalese to nature disappeared, and their skills to deal with natural phenomena were also erased. Unlike the Dutch settlers, they lived observing and following the laws of nature as Joella van Donkersgoed and Muhammad Farid write in their article, "At the outset, they lived heathen lives while observing and following the laws of nature" (418). They followed the rhythm of nature and had harmonious relations with nature which after the conquest of the land by the Dutch was ignored. They talk about three instances to show how Bandalese people were connected with nature:

The first is when a brother falls asleep under a tree and, when he awakens, he realizes that the sea has receded and left the beach strewn with food resources. A second example is when the sister realizes how the sun traverses through the sky and relates this to the ebb and flow of the sea. At that moment they are residing on Mount Kilsarua, which means looking at the sun. The third is the well-known legend of the discovery of a water source on the island of Banda Besar, which was created when the sister stumbled and her feet met the ground. The water source was discovered by the brothers when they noticed a wet cat coming out of the bushes. They decided to settle near the water source. (418-19)

As the quote clarifies the Bandalese siblings (brother and sister) realize and communicate with natural objects to conclude. After waking up under the tree, the brother sees the sea receded leaving bountiful food stuffs for him. Sun traveling through the sky and its shadow appearing in the sea relates this to the ebb and flow of the sea. In the same way, in the third example, the brother sees the cat coming from the bushes and he immediately realizes that there is a water source as the cat had lived there. And they decided to settle near the water source. It tells us that humans cannot live without natural blessings bestowed on them. For them, the sea is not merely the source of food stuffs, it provides religious and cultural networks, "The sea not only provides food, it also brought religious knowledge and trade relations. The sea and the ability to navigate the marine environment is therefore an essential part of life" (421). The native people used boats to navigate through the marine world. Boats, sea, native knowledge, and skills are essential parts of their life.

Colonial genocide designed for economic motives is best gained at the cost of environmental degradation. Environment and industrialization stand in sharp contrast to each other. Industrialization in the modern period, due to the rapid growth of the

economic mindset of treating the earth as a resource owes much to colonialism. Ghosh clarifies, "After all, what happened in the Banda Islands was merely one instance of a history of colonization that was then unfolding on a vastly larger scale on the other side of the earth, in the Americas" (18). Treating nature as a resource paves the way for environmental crises. Nutmeg's movement from its native Banda islands reveals a prevalent colonial attitude of domination of human life and the environment that persists today in different forms. Ghosh observes, "The modern era, it is often asserted, has freed humanity from the earth and propelled it into a new age of progress in which human-made goods take precedence over natural products" (18). The ecological degradation that the present world is facing is the result of the imperial world of the past that continues in different forms. Ghosh links the origins of our current planetary crisis (COVID-19) to Western colonialism's ruthless exploitation of human life and the natural world.

Prasenjit Duara highlights how the reckless use of environmental resources can have negative consequences on the environment, "In the large societies of contemporary China and India, the continued patterns of present use and consumption of environmental resources will have incalculable consequences upon the world's environment" (32). The problem of environmental degradation is seen in the world including Asian countries like China and India. The act of controlling nature is harmful as it does not provide any alternative solution to protect the world, "In modern Asia, the mainstream obsession with pursuing the goal of controlling and manipulating nature has not provided us with too many helpful examples of efforts to realize alternative goals" (33). The point Duara is making is that the government or the mainstream obsession with pursuing the goal of controlling and manipulating nature does not involve any rational logic if seen from an environmental perspective. The crisis has led to environmental movements. Duara posits:

This was also reflected to some extent within Asia where the effects of high-speed growth in much of East and Southeast Asia upon the natural conditions of livelihood and environmental degradation led to the emergence of environmental movements in the 1980s. In the second type, the developing countries, the impact of industrialization and urbanization was found to be felt most acutely by marginal populations, particularly peasants, forest and fishing communities, and those displaced by large construction projects. (40)

High-speed growth in the name of development has adverse effects on the conditions of livelihood and the environment. It will have more impact on the marginal communities that are displaced by large construction projects. The colonial mentality as discussed by Ghosh goes on destroying not only inhabitants but also dwellings. Jan Coen's activity of killing the Bandalese and extracting the nutmeg proves this "To burn everywhere their dwellings" (23). Coen destroyed the dwellings of inhabitants so that the survivors could not survive anymore. He ravaged the village, "He took village's bale-bale or meeting hall which he requisitioned as a billet for himself and for his counselors. Moreover, he has occupied the most venerable mosque, where Bandalese could pray and worship" (21). As the quote tells the Dutch official Coen took control of the village's meeting hall, and mosque to detach the Bandalese with cultural ties. The fleet that he brought to this island was the largest as it consisted of 18 Dutch ships with more than two thousand men. He ordered all the inhabitants to leave the land peacefully. However, this plan does not work well, "But the plan does not go smoothly; instead of surrendering, large numbers of islanders flee into forests" (21). The forests were the natural home of the Bandalese. They respected the land and forests. However, as they were either killed or displaced, the treatment of land as a mother has changed into a mere resource.

Thus, Amitav Ghosh identifies the beginning of the planetary due to the total exploitation of both lands and people for trade and profit which became the prevailing mode of growth in the world economy causing severe damage to the natural world.

Colonial Projects of Muting and Savagery

Ghosh talks about how Dutch officials were interested in the politics of muting and savagery. For them, banda islanders and nature are similar because they are mute and savage. Ghosh vehemently critiques this idea and asserts that even nature has sounds that make meanings. He argues, "Until then, no matter that they have tongues, voices, and languages, brutes are effectively mute, like Nature itself, which also makes sounds but makes no meanings. In this view of the world, the sounds of Nature are not equivalent to utterances; they are the products of mechanical responses and reactions" (189). The Bandalese were brutes to Dutch people who had come to conquer the islands. Despite having tongue and language, these people were considered brutes by the Dutch. By this discourse, the Dutch people went on to create colonies to have a monopoly over the nutmeg trade. They thought of nature as having no agency. Ghosh further observes,

"Colonization was thus not merely a process of establishing dominion over human beings it was also a process of subjugating and reducing to muteness an entire universe of beings that was once thought of as having agency power of communication and the ability to make meaning animals, trees, volcano and nutmegs" (190). The quote highlights that the colonial project was not only a process of establishing dominion over the human world but equally was a process to dominate and exploit the natural world by reducing them to the stage of muteness having no agency to communicate and exchange their experience. This helps colonizers to reduce nature and inhabitants' value as brutes, "It is by representing a vast continuum of human and nonhuman beings as brutes that the colonizer turns into resources, to be used as slaves, servants, and commodities" (190). From the politics of brutes, the colonizers understood and treated nature as a mere resource.

The problem associated with the politics of brutes is that it promoted environmental degradation because when islanders were deprived of their natural right to communicate with trees, jungles, and nature, the ecological balance was disturbed. In this regard, Ghosh asserts, "At this moment in time, when we look back on the trajectory that brought humanity to the brink of a planetary catastrophe, we cannot but recognize our plight is a consequence of how certain classes of humans – a small minority have actively muted others by representing them as brutes as creatures whose presence on earth is solely material" (195). It is through the logic of savagery and brutes, that the colonial projects made a small portion of the population have dominion over the majority of people like Banda islanders. They have actively muted other people like Bandalese by representing them as brutes as creatures whose presence on earth, as they assume, is solely material and physical to serve the colonizer. Non-humans are not as mute as the Dutch thought of them. They unmute themselves at the right time As reflected by Ghosh, "Non-humans too are no longer as mute as they once were. Other beings and forces – bacteria, viruses, glaciers, forests, the jet stream, have also unmuted themselves and are now thrusting themselves so exigently on our attention that they can no longer be ignored or treated as elements of inert Earth" (196-197). The different life forms that which colonial mindset rejects as beings unfold their voices, and unmute themselves, thus they cannot be ignored. With this concept, the forest areas have been opened up to meet the objectives of capitalism.

Ghosh pours his dissatisfaction against administrators, and missionaries who promote colonial projects calling indigenous relation to land superstitions, "Forest peoples' sacred mountains have been desecrated, their lands have been swamped by dams and their beliefs and rituals have come under attack as primitive superstitions— the same term used by colonial administrators, scientists and missionaries" (196). The lands are swamped by dam construction, the sacred mountains have been desecrated and their rituals are thought to be superstitious practices.

The discourse of muting and unmuting helps colonizers rationalize their colonial project. They take the muteness of nature and Bandalese as savagery and uncivilization. It leads to an ecological crisis as nature is subdued, controlled, and used as a resource in the name of muteness. Theoretically, this has been highlighted by Chad Anderson in these words, "Using the tools of civilization, namely, cartography and writing, Europeans claimed lands and peoples whose purpose in history was to wait for European discoverers" (490). Europeans' doctrine of discovery suggests the agency of civilized European explorers who can control the native people by hook or crook due to the passivity of natives. Ghosh also highlights this issue in his text.

Nutmeg and (Monstrous) Gaia: A Blessing or A Curse?

The Nutmeg's Curse: Parables for a Planet in Crisis revolves around a conflict between white settlers and Bandalese due to the nutmeg— a spice that is used for medicinal purposes and also functions as an identity marker for rich people in medieval Europe. Ghosh in the text highlights trade networks developed across the world due to nutmeg, "The nodes and routes of these networks, and the people who were active in them, varied greatly over time, as kingdoms rose and fell, but for more than a millennium the voyage of the nutmeg remained remarkably consistent, growing steadily in both volume and value" (9). The trading networks stretched across the Indian Ocean. It has a long history from the 16th and 17th centuries to modern times.

Europeans went to Banda islands through the Indian Ocean and tried to impose monopolies over the nutmeg trade. For them, the easy solution to have dominion over the Banda islands was to eliminate 15000 Bandalese by killing, enslaving, or forcing them to leave the land. Why the story of the Banda islands was so significant because the tree was a blessing for islanders for centuries but finally it turned out to be a curse. It became a curse because it was viewed as a resource by the Europeans which they

snatched through genocide. Nature despite being benevolent, revolts back to humans if they go on treating nature as crossing the limit.

The image of Earth as the mother Goddess is highlighted by Carolyn Merchant. In *The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution*, she observes how nature was worshipped as a mother Goddess, "Central to the organic theory was the identification of nature, especially the earth, with a nurturing mother; a kindly beneficent female who provided for the needs of mankind in an ordered, planned universe" (2). Nature was considered a life-sustaining force yielding necessary things for human beings. The metaphorical implication of earth as mother gradually disappeared as scientific worldview started to consider nature or earth as resources to be used and explored. The nature-mother affinity is also discussed by Greta Gaard:

Moreover, arguments that appeal to the biological "closeness" of women and nature are more often used to justify women's "natural" role as caregivers and child-bearers rather than as bricklayers or politicians. In sum, essentialist arguments tend to become regressive, and they do nothing to challenge the dualisms of patriarchal thought, which associate men/reason/culture and define them in opposition to women/emotion/nature. (20)

Just like a mother, Gaard asserts that nature and women are naturally assigned the role of caregivers and child bearers. The dualistic principle is an outcome of a past colonial mindset that continues in different forms.

In the same way, the Indian ecologist, Vandana Shiva's idea of double domination of nature and marginal groups is continued in developmental activities guided by anthropocentric culture, "In fact, however water, soil fertility, and genetic wealth are considerably diminished as a result of the development process" (73). Due to the developmental activities, soil fertility is diminished and bio-diversity is affected. It poses a threat to the whole world harmonious relationship between nature and humans is degrading. She shows humanity suffers more when there is environmental degradation. Her idea is assimilated in the idea of Ghosh who speaks against the development designed at the cost of bio-diversity. In the same way, Maria Miles worries about nuclear weapons and bombs produced by science. She mentions, "The ecology movement, … repeatedly campaigned against the construction of nuclear power plants because nuclear power is a source of energy so dangerous that it cannot be controlled by human beings" (91).

The quote clarifies that the construction of nuclear power are result of colonialism and it destroyed nature and human life. When this power is exercised, human beings cannot control it. It results in human casualties.

Timothy Luke brings the image of Earth First to talk about the biocentric approach to dealing with life. He talks about the Earth First project, "Earth First! pursues goals that are not mainly economic; instead it consciously struggles over the power to socially construct new identities, to create democratic spaces for autonomous social action, and to reinterpret norms and reshape institutions" (30). He does not prefer the economic struggles to gain profit at the cost of ecological disaster. Thus, he brings reference to biocentrism, "Earth First! envisions its program as being substantively "posthumanist" or biocentric" (40). Biocentrism is an earth-centered approach that was practiced by Banda islanders. When the Dutch came to conquer the islands, anthropocentrism began to take its sharp shape. They ignored Earth and treated her as a resource. Earth was a mother goddess and a sacred place, "Our argument in this chapter is that the making of capitalism as a mode of production was inseparable from the coeval processes of violent subordination that took place in Asia at the hands of the Europeans" (Anievas and Kerem 221). They argue that capitalism is the source of violence that prepares the ground for ecological destruction.

According to Greek myth, Gaia is considered for Earth. It is the symbol or personification of Mother Earth or nature. Since Earth is bountiful, it has motherly qualities and feeds those who nourish her. Indeed, she is gentle. However, she is also cruel and can show her terrifying figure in different forms. Her resentment and dissatisfaction are revealed through a series of disasters. She creates different life forms and destroys them as well, she is not a dead entity as the colonial project once thought, and she remains a strong life forever.

Ghosh praises the beauty of Banda islands as they are blessed with such fertile and diverse land. Land for Bandalese was more than a place that was blessed with nutmeg. Bringing reference to indigenous thinker Max Lioiron, Ghosh talks about the Banda islands. The land is significant as having meanings in itself, "The unique entity that is the combined living spirits of plants, animals, water, humans, histories, and events" (36). However, for Dutch official— Jan Coen, the islands are nothing more than a resource, "For Jan Coen and the VOC, on the other hand, the trees, volcanoes, and landscapes of the Bandas had

no meanings except as resources that could be harnessed to generate profit" (36). This concept of treating nature as a resource is the root cause of the environmental crisis. Though colonialism ends the colonial mindset to dominate or exploit nature remains constant. Ghosh observes that this is prevalent in the modern world, "As the ideologies of modernity were rising to dominance, the war against vitalism would go hand in hand with the expansion of European projects of colonialism and conquest" (87). The project of colonialism continues to dominate the natural projects.

Ramachandra Guha talks about how the landscapes were reshaped in the 18th and 19th centuries to promote industrialization, "In the eighteenth and nineteenth centuries the landscapes of England was reshaped by the industrial revolution. Coal mines, textile mills, railroads, and shipyards were the visible signs of an enormous expansion of industry and trade…" (10). The trade that started in the pre-industrial society supported colonialism and industrialization. Guha further brings the point to the fore, "Strikingly, this hostility extended to indigenous forms of land use, that is, to the varieties of pastoralism and cultivation practiced by African and Asian communities in territories recently colonized by Europeans" (30). The areas cultivated and planted by local people are now recently colonized by white settlers.

Guha brings reference to an artist, art critic John Ruskin whose idea of water and land pollution makes Guha aware of how earth has been used as a resource, "This destruction, he thought, owed itself to the fact that modern man had desacralized nature, viewing it only as a resource of raw materials to be exploited and thus emptying it of mystery, the wonder, indeed the divinity with which pre-modern man saw the natural world" (13). The idea of Guha related to earth resources is also highlighted by Ghosh, "The project of terraforming enframes the world in much the same way that the Banda Islands came to be seen by their conquerors: this is the frame of world-as-resource, in which landscapes (planets) come to be regarded as factories and nature is seen as subdued and cheap" (73). The conquerors in the Banda islands viewed the world as a resource as they captured the islands for the nutmeg which they used to earn money using it as a resource.

Ghosh makes a comparison between white men and local ones who perceive nature as Mother Earth. White settlers say that nature means a savage wild area which Ghosh never agrees with, "Only to the white man was Nature a wilderness and only to him

was the land infested with wild animals and savage people. To us it was tame. Earth was bountiful and was surrounded with the blessings of the Great Mystery" (64). It indicates that for the Bandalese, the Earth was bountiful and they were blessed with beautiful things that they could use for their livelihood. Earth was Gaia and a living entity.

Talking about Gaia, Ghosh mentions that she is both benevolent and monstrous. She is a kind and motherly deity because she can give birth and nourish with care. She is the epitome of love and affection, and yet the same time, she is monstrous as well. She can plot against the force she hates. With the help of her son— Kronos, his father's genitals are cut off. Her anger is targeted at Uranos whom she mates to produce many children but when he hides them under her, she cannot bear any longer. Ghosh is concerned, "Gaia tires of this and finally- groaning within, she conceives a cunning evil trick. She makes a serrated sickle out of an indestructible element, adamant, and shows it to her children" (88). The revolutionary nature of Gaia indicates the fact that she can take back whatever she has given to the world, "But what Earth gives, it can also take away" (159). She endures patiently but when the limitation is crossed, she shows her angry nature as S.P. Lohani writes, "Yet—she endures" (176). The ruthless exploitation of her unfolds many crises which we have to face.

To show the current predicament of humanity, Ghosh talks about COVID-19 as an outcome of climate change which has its links to colonial projects of the past because he explains that the infectious diseases are the results of economic activity like nutmeg trade, "I began writing this chapter in early March of 2020, at just the time when a microscopic entity, the newest coronavirus, was quickly becoming the largest, most threatening, and most inescapable presence in the planet" (14). The seemingly insignificant microscopic entity, the coronavirus, is creating havoc, threatening the whole world. Ghosh was writing this book when the virus was making its voyage across the world. He shows the links between climate change and COVID-19:

There is of course no direct causal relation between climate change and the Covid – COVID-19 pandemic; they are not unrelated issues either. Just as global warming is the result of ever-increasing economic activity; it is clear now that outbreaks of infectious diseases are also a hidden cost of economic development brought about by changing land use and human intrusions upon wildlife habitats. (133)

Ghosh means to say that climate change and the COVID-19 pandemic are related issues. Just like the ever-increasing economic activity is responsible for global warming, the outbreaks of infectious diseases are the results of changes in landscapes and terraforming. He opines, "The usual conclusion is that disasters and outbreaks of new diseases will not only take a terrible toll on lives in the poor countries but will also lead to riots and uprisings that could culminate in the collapse of state structures" (138). The lines indicate the possible violence along with the outbreaks of new diseases that take a terrible toll on lives.

Treating the earth as a resource brings problems. The newer forms of ecological disasters keep unfolding across the world, "The point is that the newer forms of ecological disasters unfolding across the globe tell that it is harder to believe that earth is an inert body that exists merely to provide resources to humans" (83). The quote mentions that treating the earth as an inert body is problematic; it is a dynamic entity that is a platform for many creatures to evolve and co-evolve. He reflects that what is going on around the world from the dawn of European colonial conquests to the ongoing COVID-19 pandemic is the result of economic viewpoints that dominate Earth. Ghosh suggests, "In that sense climate change events and the Covid-19 pandemic are cognate phenomena, and the paths taken by the pandemic suggest that the planetary crisis too will unfold in surprising and counterintuitive ways" (133). He foresees that the world is going through a crisis in the days to come because people have not understood the real meaning of Earth as Ghosh argues, "The planet will never come alive for you unless your songs and stories give life to all the beings; seen and unseen that inhabits a living Earth –Gaia" (84). So it is attitude how one treats Mother Earth. He further talks about omnicide. The vision of the world as a resource leads not only to genocide but to omnicide, "An excess that leads ultimately not just to genocide but an even greater violence an impulse that can only be called omnicide- the desire to kill everything" (7). The omnicide means destruction of all life forms including human beings.

Conclusion

In conclusion, the Banda islands massacre involved ruthless exploitation of both nature and the human world by Dutch settlers which resulted in killings, enslavement, and escaping of Bandalese. As the Bandalese were either killed or enslaved, their cultural implications associated with nature were also erased as Dutch colonialism understood

nature as the only resource. For the Bandalese, nature was a sacred land; it was a blessed land that was full of diversity. The exploitation of islands by Dutch people imposing monopolies on nutmeg trade by killing native people poses a threat to ecology. The journey of nutmeg from Banda to the rest of the world through the global networks that began with genocide has resulted in omnicide. Indigenous understanding of nature was that it was a living entity. In this modern era, people have started to think of nature as an inert object that has no power to act. The earth does not care about us; it will be there even if we all are gone. It remains completely indifferent to our being or not.

Works Cited

Anderson, Chad. "Rediscovering Native North America: Settlements, Maps, and Empires in the Eastern Woodlands." *Early American Studies*, vol. 14, no. 3, 2016, pp. 478–505. *JSTOR*, https://www.jstor.org/stable/earlamerstud.14.3.478. Accessed 8 May 2023.

Anievas, Alexander, and Kerem Nişancioğlu. "Combined Encounters: Dutch Colonisation in Southeast Asia and the Contradictions of 'Free Labour.'" *How the West Came to Rule: The Geopolitical Origins of Capitalism*, Pluto Press, 2015, pp. 215–44. *JSTOR*, https://doi.org/10.2307/j.ctt183pb6f.12. Accessed 8 May 2023.

Byravan, Sujata. "The Nutmeg's Curse' review: Listening to nature's voice." In The Hindu October 23, 2021. https://www.thehindu.com/books/books-reviews/the-nutmegs-curse-review-listening-to-natures-voice/article37122733.ece.

Das, Saswat Samay, Ananya Roy Pratihar, and Dipra Sarkhel. "Review: the nutmeg's curse: parables for a planet in crisis." *Environmental Politics*. 2023. https://doi.org/10.1080/09644016.2023.2183632.

Donkersgoed, Joella van. "Virtual meeting ground for colonial (re)interpretation of the Banda Islands, Indonesia." *Wacana,* vol. 20, no. 2, 2019, pp, 266-285.

Donkersgoed, Joella van, and Muhammad Farid. "The significance of nature in the adat practices in the Banda Islands." *Wacana*, vol. 23, no. 2, 2022, pp. 415-450. doi:10.17510/wacana.v23i2.1100.

Duara, Prasenjit. *The Crisis of Global Modernity: Asian Traditions and a Sustainable Future.* Cambridge University Press, 2015.

Gaard, Greeta. *Ecological Politics: Ecofeminists and the Greens*. Temple University, 1998.

Ghosh, Amitav. *The Nutmeg's Curse: Parables for a Planet in Crisis.* Penguin Random House, 2021.

Guha, Ramachandra. Environmentalism: A Global History. Longman, 2000.

Kurian, Anna. "Why We Cannot Memorialize the Covid-19 Dead." In The Wire7June2021. https://thewire.in/righ ts/why-we-cannot-memorialisethe-covid-19-dead.

Lohani, Shreedhar Prasad. "Gaia." *Flax Golden Tales: An Interdisciplinary Approach to Learning English*, edited by Moti Nissani and Shreedhar Prasad Lohani, Ekta Publishing House, 2012, pp. 176.

Luke, Timothy W. *Ecocritique: Contesting the Politics of Nature, Economy, and Culture*. University of Minnesota Press, 1999.

Merchant, Carolyn. *The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution*. Harper & Row, 1990.

Miles, Maria. "Who Made Nature Our Enemy?" *Ecofeminism*: *Maria Miles and Bandana Shiva*, edited by Ariel Salleh, Zed Books, 2014, pp. 91-97.

Naimark, Norman M. *Genocide: A World History.* OUP, 2017.

Thakur, Ashutosh Kumar. "Book Review: The Nutmeg's Curse: Parables for a Planet in Crisis by Amitav Ghosh." *The Outlook,* 07 Nov. 2021, https://www.outlookindia.com/website/story/entertainment-news-book-review-the-nutmegs-curse-parables-for-a-planet-in-crisis-by-amitav-ghosh/400080.

Winn, Phillip. "Slavery and cultural creativity in the Banda Islands." *Journal of Southeast Asian Studies*, vol. 41, no.3, 2010, pp 365–389. doi: 10.1017/S0022463410000238.

- - -, "Banda is the Blessed Land': Sacred Practice and Identity in the Banda Islands, Maluku." *Antropologi Indonesia,* 57, 1998, pp. 71-79.

Van Ittersum, M. J. "Debating Natural Law in the Banda Islands: A Case Study in Anglo-Dutch Imperial Competition in the East Indies." *History of European Ideas*, vol. 42, no. 4, 2016, pp 459-501. https://doi.org/10.1080/01916599.2015.1101216.

BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2023v5i2eg5
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -V, Issue-II, December 2023
Pp. 112-117

Ecocritical Reading in Select Works of Rabindranath Tagore

Professor Sharif Atiquzzaman

Professor Sharif Atiquzzaman
Principal
Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh
e-mail : sharifatiquzzaman65@gmail.com

Abstract

Ecocriticism, as an interdisciplinary field of study, has added significant facets to literary criticism. We notice that the recent ecocritical philosophies have been reflected with gravity in Rabindranath Tagore's works before it was recognised as a discourse. The eco-consciousness that he carefully cultivated in his life was portrayed with great emphasis in his literary and artistic creations. Tagore believed that literature could be a useful tool to reduce environmental disasters and promote the ecosystem by developing consciousness through it.

Tagore deemed that the rocky and cruel earth was made habitable only by growing trees. Tree to him was the life founder. So he always sought the development of a close bond between men and trees. With his mystic and spiritual perception of nature, he tried to relocate man's position in nature. His plays like 'Raktakarabi', 'Muktodhara', 'Srabangatha', a good number of poems, and his paintings show his ideas about deep ecology, shallow ecology, ecofeminism, social ecology, ecophobia, and the other aspects of ecocriticism. Segregation of humans from nature is declined in the concept of deep ecology. In some of his writings and lectures, Tagore defended the notion of kinship between man and nature. The idea, that human beings, should take care of nature for their own sake, is related to shallow ecology, and Tagore as the defender of nature worshipped it as a source of regeneration.

Keywords

Ecocriticism, Man, Nature, Earth, Ecology, Environment

Objectives

Nature is always a major theme in literature, but the deep concern for the present environmental crisis has made it a significant global issue. When the issues of gender, race, religion, class, identity, human rights, etc. held the central position of literary creations throughout the 20th century, ecocriticism emerged as a study of relationship between the physical environment and literature in the 1990s. The present paper briefly examines the aspects of the environment reflected in the select writings of Rabindranath Tagore (1861-1941). It also focuses on the concerns of Tagore who was more critical and reactive to the dangers caused by environmental hazard, destruction of wilderness and materialism.

Methodology

This paper has been written within the inter-disciplinary framework examining and discussing the secondary data collected through books, journals, websites, etc.

Introduction

Nowadays people realise the interdependence of man and nature. Their concern for protecting the environment from man-made disasters has become a global issue. A positive response is developing all over the world regarding ecology. As ecocritical reading is a broader understanding of literature and the environment, Tagore showed concern and commitment in this regard. His engagement with nature is a leitmotif in his works of creation. About a century ago, he realised the inevitability of saving nature from destruction. He felt the necessity of preserving all the natural components to form a bubble of life.

There was no organized movement to support ecocriticism before the conference of the Western Literature Association in 1989 in the USA where Cheryll Glotfelty said, 'Just as the feminist criticism examines language and literature from a gender-conscious perspective, and Marxist criticism brings an awareness of modes of production and economic class to its reading of texts, ecocriticism takes an earth-centred approach to literary studies.'[1]

Thus, ecocriticism rejecting the notion that everything is socially or linguistically constructed includes other theoretical views such as deep ecology, shallow ecology, Marxist environmentalism, environmental justice, ecofeminism, land ethics, etc. It is

evident that ecocriticism came out with a simple agendum to save the environment.

Rabindranath shows his environmental awareness in almost all the genres of literature he composed. His poems, songs, short stories, novels, plays, essays, etc. embodied plenty of environmental issues. Everywhere, he emphasized the harmonious co-existence between man and nature. He warns human beings about the dire consequences of destroying environment. He laments in his poem *Sabhyatar Prati* (To Civilization) for a lost world abundant with natural resources.

> Give back that wilderness, take away the city –
> Embrace if you will your steel, brick, and stonewalls
> Of newfangled civilization! Cruel all consuming one,
> Return all sylvan, secluded, shaded and sacred spots
> And traditions of innocence. Come back evenings
> When herds return suffused in evening light"[2]

The poem is a critique of modern civilization which is built on the exploitation of nature. Tagore as a defender of rural life urges people to protect the environment. He has paid glowing tribute to the trees and vegetation in his poem "Briksha Bandana" (Tree worshipping) where he reminds us that trees had the existence on earth long before man and animal existed. Trees graced with the light of the sun came into life and made the barren desert green. Worshipping trees is an expression of gratitude and inspiration of love for the green world.

He established 'Shantiniketan' in the lap of nature where he started the events of celebrating different seasons and introduced 'Halkarshan' (tilling the land) with great enthusiasm. The recurrent portrayal of seasonal beauties in his paintings reflects his love as well as concern for nature. He also voiced against the cornucopian view that holds the belief that the earth has abundant resources, and concern for environmental dangers is illusory and exaggerated. Bibhuti is a character of that type in Muktodhara. Tagore acknowledged the advancement of science but revolted against the exploitation of nature by science. He, much before the Western campaigners, actively thought about maintaining ecological balance and dreamt of a world that ensures congenial living for all.

Raktakarabi which was first given the title *Yakshapuri* is one of the most complex plays of Rabindranath Tagore in verse. The play reveals how human greed destroys the beauties of nature making it a mere source of profit. The play takes place in a kingdom called *Yakshapuri* where the king stays behind an iron curtain and people are forced to work in the gold mines to dig out gold to make him wealthier. He was so cruel that he didn't hesitate to kill them on the slightest pretext. Finally, there comes Nandini who leads them to a revolt. Her indomitable spirit guides her to stand against the king. She mocks the king for hiding behind his enclosure. Nandini symbolises freedom. Her sole ornament is her jewels crafted out of Red oleander (Raktakarabi), which she wears as a tribute to Ranjan, the man she loves. Nandini appears from the rhythm of nature. Through this drama, Tagore reveals the constant repression of the weak by the powerful and the exploitation of nature by greedy people. 'Here Rabindranath pointed out that the greed of man's power alienates him from enjoying the beauty of growing grass on the earth and blooming flower plants. He was very much aware that man's greed gradually was taking away the fertility of the land, caused global warming. Plantation, in his view, is necessary to fulfill the damage occurred by man due to deforestation. He introduced it in Sriniketan and Shantiniketan under the name of *Halokarsan*.'[3]

Ecofeminism stands against patriarchy and capitalism. It rejects the oppression of women and nature by mischievous people and urges for the liberation of women and nature. "The same habitual structures of thought, feeling and action that devalue and harm women also harm nature."[4] Thus, ecofeminism declares that the agents who oppress women and nature are the same.

Raktakarabi is a play about Nandini's revolt against an oppressive king to free nature and man from his enormous greed. Tagore conveys the message that the vast industrialization throughout the world would result in diminishing human compassion and cause Ecological Imbalance. So he used characters as a metaphor of human instincts such as greed, power, envy, love, trust, and sacrifice. 'While on one hand, Tagore reveals the unequal social structure that oppresses women, on another, he creates courageous women who challenge tradition.'[5]

Tagore's immense love for nature is found in almost every genre of literature he created. Tagore wrote songs under the title 'Prakriti-parjaay' where 'prakriti' stands for nature and 'parjaay' stands for section, in which he urged to maintain adequate balance between

human activities and environment. Tagore's play 'Muktadhara' (The Free Fall) centres around a waterfall and a dam which has been built by Bibhuti, the royal engineer of Uttarakut according to the order of King Ranajit to deprive the villagers of Shivtarai. Going against the king, Abhijit, the foster-prince finally succeeded in breaking the dam and letting the water of the fall flow with its usual course. The play conveys Tagore's strong objection to human efforts of subjugating nature.

In the song, *Khanchar Pakhi* (Tame Bird in a Cage), Tagore nicely portrays the agony of a caged bird that can't sing the song of woodlands and its inability to fly into the forest for losing power and having dead wings. Tagore being a defender of nature always denounced unusual activities harmful to nature and its habitants. He was very anxious about the unrestrained exploitation of forest resources. Tagore said that by destroying nature, greedy people are digging out their graves. People have uprooted trees that give us clean air and help us make our land fertile. Completely forgetting their benefits, man has destroyed all the gifts of nature. Being concerned for nature, and wishing a harmony between man and nature, which is an essential prerequisite of sustainable living condition, is also reflected in establishing Santiniketan on his vision. The seasonal festivals of *Barshamangal*, *Brikhharopana* (Tree Planting Ceremony), etc. at Shantiniketan bear witness to his love for nature and untiring efforts to aware people of sustainable living by preserving ecological balance.

Conclusion

Rabindranath expressed deep concern for environment much before the western development thinkers, and campaigned much to maintain ecological balance. Tagore opined in many of his writings that development activities are necessary but not at the irreparable cost of environment. Tagore dreamt of a world which ensures congenial living not only for us but also for our progenies.

References

1. Cheryl Glotfelty and Harold Fromm, Ed., *The Ecocriticism Reader,* University of Georgia Press, USA, 1996, p. III.

2. Original translation of the poem occurs in Fakrul Alam and Radha Chakravarty, ed.,The Essential Tagore, Visva-Bharati edition, p.223.

3. Environmental Concerns and Rabindranath Tagore: Some Relections, Sanghamitra Dasgupta, Philosophy and Progress: Vols. XLIX-L, January-June, July-December, 2011 ISSN 1607-2278 (Print), DOI : http://dx.doi.org/10.3329/pp.v50i1-2.11921]

4. Curry, Patrick. M. Ecological Ethics. Polity Press: Cambridge, 2006, p. 95

5. Ray, Bharati, 'New Women' in Rabindranath Tagore's Short Stories: An Interrogation of 'Laboratory', Asiatic, Vol.4, No. 2, December 2010. Web, 19 January 2022